কৃষিজমিতে শিল্প

সরকার

ও

আমরা

এস ইউ সি আই

কৃষিজমিতে শিল্প
সরকার ও আমরা

সিপিএম সরকারের এখন একটাই স্লোগান — শিল্পায়ন ও উন্নয়ন। দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির ওপর নির্ভর করেই নাকি শিল্পায়নের রথ চলবে। এর হাত ধরেই আসবে উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান। কৃষিতে 'বিরাট সাফল্য' এসে যাওয়ার পর এখন তাকে ভিত্তি করেই সিপিএম শিল্পায়ন ও উন্নয়নের স্বপ্ন ফেরি করছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে তাদের তাবড় তাবড় নেতাদের মুখে এখন নিত্যনতুন শিল্পের ফিরিস্তি। অন্যদিকে, দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুখে সিপিএম-সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তির অকুণ্ঠ স্তুতি। ওদের ভাবখানা এমন যেন ওরা আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছেন, যার ছোঁয়ায় উন্নয়ন তরতরিয়ে দেখা দেবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ''কর্মসংস্থানের পথ খুলতে হবে আমাদের। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের কাজ চাই। এই কাজের ব্যবস্থা করতেই রাজ্যে শিল্প গড়তে হবে, আর সেই শিল্পের জন্য জমি দরকার'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯-৫-০৬)। এ'কথা বলেই রাজ্য সরকার সিঙ্গুর, রাজারহাট, ভাঙড়, নন্দীগ্রাম, বারুইপুর, হরিপুর, কাটোয়া, ফুলবাড়ি, কুলপি প্রভৃতি এলাকায় বিপুল পরিমাণ জমি অধিগ্রহণ করছে, বা অধিগ্রহণ করতে যাচ্ছে। প্রতিদিন নতুন নতুন এলাকার নাম ঘোষিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় উচ্ছেদের কী বিপুল আয়োজন করতে হবে, দু'একটি এলাকার বিবরণ দিলেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

উচ্ছেদের বিপুল আয়োজন

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের জন্য নন্দীগ্রামে সালিম গোষ্ঠীকে জমি দেওয়া হচ্ছে ১৪,৫০০ একর। এ'জন্য সরকারি হিসাবেই উচ্ছেদ করতে হবে ১৫ হাজার পরিবার, ১২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৭টি মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা, এছাড়া অসংখ্য মন্দির-মসজিদ, বহু শ্মশান ও কবরস্থান (সূত্র ঃ আজকাল, ১০-১২-০৬)।

কুলপিতে প্রস্তাবিত নৌবন্দর ও এসইজেড-এর জন্য উৎখাত করতে হবে ১৯৯১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ২৩ হাজার ২৮৫টি পরিবারের ১,৩১,৯০৬ জন মানুষকে। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ধরলে উৎখাত হওয়া মানুষের সংখ্যা আরও বহুগুণ বাড়বে। এছাড়াও ধ্বংস করতে হবে ৮৪টি প্রাইমারি স্কুল, ৭টি জুনিয়র স্কুল, ৮টি

সেকেন্ডারি-হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ২টি সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৪টি গভীর নলকূপ, ১টি মাদ্রাসা, ৮টি হাট ও বাজার ইত্যাদি।

জুনপুট-হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য কত মানুষকে উচ্ছেদ হতে হবে ? ৭০ হাজারের মতো সাধারণ মানুষ, ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি হাইস্কুল, ১২টি বেসরকারি স্কুল, ৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১০টি বাজার, ৮টি হাট, প্রায় ৭ হাজার পুকুর (সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান, ২৫-১১-০৬ ও ২৬-১১-০৬)।

উচ্ছেদের এই বিপুল আয়োজন প্রবল গণঅসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বল জমিটুকু হারাবার আশঙ্কায় কৃষক-খেতমজুর-বর্গাদাররা গড়ে তুলেছেন প্রবল প্রতিরোধ। আর তাকে গুঁড়িয়ে দিতে রাজ্য সরকার নামিয়েছে পুলিশ, কমব্যাট ফোর্স, র‍্যাফ ও আধা-সামরিক বাহিনী। তার সঙ্গে নামানো হয়েছে সিপিএম-এর ক্রিমিনাল বাহিনী। ব্রিটিশ শাসনে গণআন্দোলন ভাঙতে পুলিশ-মিলিটারি নামানো হয়েছে, কংগ্রেস শাসনে গণআন্দোলন ভাঙতে পুলিশি অত্যাচার হয়েছে, মিলিটারি নেমেছে। কিন্তু সিপিএম গণআন্দোলন ভাঙতে সুপরিকল্পিত ও সংগঠিত কায়দায় যেভাবে ব্যাপক সংখ্যায় দলীয় ক্রিমিনাল বাহিনী নামালো, ইতিপূর্বে কোনও শাসনে তা দেখা যায়নি। বিশেষ করে ক্রিমিনালবাহিনীর গায়ে পুলিশের পোষাক চাপিয়ে সিপিএম যেভাবে হামলা করছে তা তাদের ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্টসুলভ চরিত্রেরই ইঙ্গিত। সিঙ্গুরে লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাস চালানো, ধানের গাদায় আগুন দেওয়া, ঘর থেকে মা-বোনেদের টেনে বের করে অত্যাচার চালানো, সবই হয়েছে। ২৫ সেপ্টেম্বর পুলিশের অত্যাচারে সেখানে নিহত হয়েছে যুবক রাজকুমার ভুল। তারপর ১৮ ডিসেম্বর ঘটেছে কিশোরী তাপসী মালিকের মর্মান্তিক হত্যা। টাটাদের জমি পাহারার জন্য নিযুক্ত সিপিএম-এর ক্রিমিনাল বাহিনী ওই ছোট্ট মেয়েটিকে ধর্ষণ করার পর আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। এই বীভৎস অত্যাচার চলেছে সিঙ্গুরে। নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষ যখন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধে সামিল হয়েছে তা দমন করতে পুলিশ-মিলিটারি নয়, রাতের অন্ধকারে আক্রমণ চালিয়েছে সিপিএম-এর সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনী। এই নন্দীগ্রাম সিপিএম-এরই দুর্গ বলে পরিচিত ছিল। সেখানে সিপিএম-এর সমর্থকরাই যখন প্রতিরোধে উঠে দাঁড়াল, তখন ক্রিমিনালদের দিয়ে তাদেরই প্রতিবাদী ৩ জন কৃষককে হত্যা করাতে সিপিএম নেতৃত্বের বিন্দুমাত্র বিবেক দংশন হয়নি। ৩ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে প্রবল গণরোষ ও প্রতিরোধের মুখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করা ভুল হয়েছে। আমরা এর পর ধীরে চলব।' আমরা বলেছি, মুখ্যমন্ত্রীর এই ভুল স্বীকার একটি ছলনা মাত্র। আসলে সরকারের পরিকল্পনা হচ্ছে, একটু সময় নিয়ে কৃষকদের মধ্যে যে লড়াকু মানসিকতা তৈরি হয়েছে — প্রলোভন, মিথ্যাচার, বিভ্রান্তি ছড়িয়ে, আন্দোলনে অনৈক্য সৃষ্টি করে, ভয়-ভীতি দেখিয়ে, তাকে দুর্বল করে দিয়ে তারপর জমি দখলের কাজে নামবে।

ফলে এটা পরিষ্কার, মিডিয়ার একাংশের সহায়তায় সিপিএম-এর সংগঠিত মিথ্যাপ্রচার এবং রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাস মোকাবিলা করেই কৃষকদের জমি রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া যে স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্টসুলভ লক্ষণ ইতিমধ্যেই সিপিএমের মধ্যে প্রকট হয়ে

উঠেছে তাতে নিশ্চিত যে, এ আন্দোলন হবে দীর্ঘস্থায়ী। সুসংবদ্ধ ও সংগঠিত না হলে, লক্ষ্য স্থির না হলে, নেতৃত্ব সঠিক না হলে এ আন্দোলন সফল পরিণতিতে যেতে পারবে না। এজন্যই সিপিএম-এর মিথ্যা প্রচারের জাল ছিন্ন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রাজ্যে অকৃষি জমি প্রচুর আছে

সিপিএম নেতৃত্ব প্রচার করছে, যারা কৃষক উচ্ছেদের বিরোধিতা করছে, তারা রাজ্যের উন্নয়নের ও শিল্পস্থাপনের বিরোধী। অর্থাৎ সিপিএম শিল্পের পক্ষে, আর এস ইউ সি আই দলের নেতা-কর্মী সহ রাজ্যের প্রতিবাদী সাধারণ মানুষ — সবাই উন্নয়নবিরোধী, শিল্পবিরোধী, কর্মসংস্থানবিরোধী, বেকারবিরোধী ! এটা অবশ্য ওদের বরাবরেরই কৌশল। যা আমরা বলিনি, সেটাই আমাদের মুখে বসিয়ে সিপিএম নেতারা তারস্বরে তার বিরোধিতা করে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালান। ৮০-র দশকে এ'রাজ্যে ঐতিহাসিক ভাষাশিক্ষা আন্দোলনে এই একই ঘৃণ্য কৌশল সিপিএম নিয়েছিল। সেদিন এস ইউ সি আই-এর দাবি ছিল, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পুনরায় চালু করতে হবে। আমাদের এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে সিপিএম প্রচার করল, ''এস ইউ সি আই মাতৃভাষারই বিরুদ্ধে''। একই খেলা এখন শিল্পস্থাপন নিয়ে তারা শুরু করেছে। কৃষিজমি বাদ দিয়ে অকৃষি জমিতে শিল্প করার কথা বললেই তারা তার গায়ে শিল্পবিরোধী ছাপ লাগিয়ে দিচ্ছে এবং সেটাই জোর গলায় বারবার প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। অথচ শিল্পস্থাপন নিয়ে কোনও বিতর্ক কিন্তু নেই। আজকে বিশ্বজুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির তীব্র সঙ্কটের যুগে যখন একটার পর একটা শিল্পে লালবাতি জ্বলছে, বিশ্বব্যাপী ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ধস নেমেছে, পশ্চিমবঙ্গেও যখন শিল্প পরিস্থিতি ভয়াবহ, তখন যদি অন্ততঃ দু'একটা শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠে, তবে কে তার বিরোধিতা করবে ? টাটা বা অন্য কোনও একচেটিয়া পুঁজিপতি যদি এরাজ্যে একটা-দুটো শিল্প ইউনিট খুলতে চায়, তার বিরুদ্ধতা করারও প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের স্পষ্ট কথা হল, কারখানা গড়তে চেয়ে হাজার হাজার একর উর্বর কৃষিজমি দখল করা হবে কেন ? লক্ষ লক্ষ মানুষকে জমিচ্যুত, জীবিকাচ্যুত ও বাস্তুচ্যুত করা হবে কেন ? এরাজ্যে কি অকৃষি জমির অভাব ? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, এরাজ্যে অকৃষি জমির পরিমাণ মোট জমির মাত্র ১ শতাংশ। ফলে শিল্পের জন্য কৃষিজমি নিতেই হবে। কথাটা কি সত্য ? রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যে মোট জমির পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ একর। এর মধ্যে চাষযোগ্য জমি ১ কোটি ৩৭ লক্ষ একর। পতিত ও বন্ধ্যা জমির পরিমাণ হল ১০ লক্ষ ৩০ হাজার ৮০০ একর। অর্থাৎ মোট জমির ৪.৭ শতাংশ। আবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি দপ্তরের প্রাক্তন সচিব শ্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যুরো অফ অ্যাপ্লায়েড ইকনমিকস অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের তথ্য উদ্ধৃত করে বলেছেন, রাজ্যে অকৃষি জমির পরিমাণ ৩০ লক্ষ ৭০ হাজার একর (দি স্টেটসম্যান, ২৮-০১-০৭)। সরকার এখনও পর্যন্ত শিল্পের নামে যে পরিমাণ জমি অধিগ্রহণের কথা বলছে, তা কমবেশি ১ লক্ষ ৪৫ হাজার একর। অর্থাৎ সরকারের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক গুণ বেশি অকৃষি জমি

এরাজ্যে রয়েছে, যেখানে অনায়াসেই শিল্প করা যেতে পারে।

প্রথম সর্বদলীয় সভাতেই (৪/১০/০৬) মুখ্যমন্ত্রীকে এস ইউ সি আই বলেছিল, উপযুক্ত পরিকাঠামো সম্পন্ন অবস্থায় অকৃষি জমি পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় প্রচুর রয়েছে। পরিকাঠামো বলতে এখানে আছে দক্ষিণপূর্ব ও পূর্ব রেল ; জি টি রোড, বম্বে রোড, ৩২নং জাতীয় সড়ক, আছে তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। দামোদর, কংসাবতী, সুবর্ণরেখা, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, অজয় সহ ছোট বড় ৩০টি নদী প্রয়োজনীয় জলের যোগান দিতে পারে। আছে বিরাট পরিমাণ খনিজ সম্পদ। কয়লা, গ্রানাইট, ব্যাসল্ট, মোল্ডি স্যান্ড, কেওলিন, রক ফসফেট, টাংস্টেন, তামা, অভ্র ইত্যাদি। তাহলে এসব জেলায় শিল্পস্থাপনে অসুবিধা কোথায় ?

''...এখনও তো দুর্গাপুরে প্রায় কয়েক কিলোমিটার এলাকা অধিগ্রহণ করা আছে, পড়ে আছে। হরিণঘাটা, কল্যাণী, একেবারে হরিণঘাটা থেকে আরম্ভ করে ৩৪নং জাতীয় সড়ক পর্যন্ত সমস্ত জায়গাটা অধিগ্রহণ করা আছে। কিছু হয় না, গরু চরে। তাছাড়া হলদিয়াতে কলকাতা পোর্টের অনেক জমি নেওয়া আছে, যেটা পোর্ট এখনও ব্যবহার করেনি। পড়ে রয়েছে। ডানকুনিতে গণি খান কয়লার জন্য জমি নিয়েছিলেন, কিছুটা হয়েছে, বাকিটা পড়ে আছে। ২৫০ থেকে ৩০০ একর জমি এই প্রত্যেকটা জায়গাতে পাওয়া যেত। যেখানে রেলপথ, রাস্তা, বিদ্যুৎ — এ'সব সুবিধা আছে। সেসব জায়গায় না গিয়ে সিঙ্গুরের চারফসলি জমির ওপর থাবা কেন ? এখানে হিন্দুস্তান মোটর গত ৫০ বছরে ৩০০ থেকে ৩২৫ একরের বেশি ব্যবহার করতে পারেনি। এই পরিমাণ জমিতেই যদি হিন্দুস্তান মোটরের কাজ হয়ে থাকে, তাহলে টাটার মোটরগাড়ির কারখানার জন্য ১০০০ একর লাগবে কেন ? ভারতে সবচেয়ে বড়ো মোটরগাড়ির কারখানা মারুতি, গুরগাঁওয়ে ৩০০ একর জমিতে বছরে ৫ লক্ষ গাড়ি বার করে।'' (দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা, মন্থন পত্রিকা)

বন্ধ কারখানার জমিও অনেক

বন্ধ কারখানার জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য হল, আইনি অসুবিধা আছে। মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র জানিয়েছেন — ''বছরের পর বছর যেসব শিল্প বন্ধ হয়ে আছে এবং যেগুলির পুনরুজ্জীবনের আর কোনও সম্ভাবনা নেই, সেসব ক্ষেত্রে মালিকরা রাজ্য সরকারের লিখিত আদেশ নিয়ে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে জমি হস্তান্তর করতে পারবেন (পশ্চিমবঙ্গের কৃষকসমাজের মিত্র ও শত্রুরা, সূর্যকান্ত মিশ্র, পৃঃ-৯)। এটাই হল আসল কথা। রাজ্য সরকার বলছে, কারখানার জমি, অর্থাৎ যা জনগণের সম্পত্তি তা মালিকদের প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করার অনুমতি দেওয়া আছে। এজন্য তো কোন আইনি অসুবিধা হয়নি ! শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন জানিয়েছেন, ''ব্যাঙ্ক বা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি কোনও কোম্পানির দেনা থাকে, তবে ঐ আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার গচ্ছিত রাখা সম্পত্তি সরাসরি দখল নিয়ে অন্য কাউকে বিক্রয় করতে তথা লিজ দিতে পারে'' (প্রসঙ্গ সিঙ্গুর ও শিল্পায়ন, পৃঃ ২৪)। প্রশ্ন ওখানেও। জমি কারখানার মালিকের নিজস্ব সম্পত্তি নয়। ফলে সে তা ব্যাঙ্কের ঘরে গচ্ছিত রাখতে পারে না। নিয়ম অনুযায়ী যে কাজের জন্য জমি নেওয়া

হল, সে কাজে জমি ব্যবহৃত না হলে ঐ জমি সরকারকে ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে। সেই জমিকে অন্য কোন কাজে লাগানোটাই বেআইনি। অথচ এ রাজ্যে মালিকরা বন্ধ কারখানার জমি দখল বা বিক্রি করে ইচ্ছামতো ঢালাও আবাসন তৈরির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে, সরকারের অনুমতিও পেয়ে যাচ্ছে। কোথাও আবার সরকারি অনুমতির তোয়াক্কাও করছে না। ''১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভূমিরাজস্ব দপ্তরের হিসাবে রাজ্যে প্রায় ২০০-র অধিক শিল্প ছিল এমন জায়গায় বেআইনিভাবে বহুতল গড়ে উঠেছে বলে বিভাগীয় তদন্তে জানানো হয়েছিল। এভাবেই হাওড়া, ব্যারাকপুর মহকুমায় একাধিক শিল্পসংস্থায় কোন সরকারি অনুমতি ব্যতিরেকে শিল্পের জমিতে আবাসন গড়ে উঠেছে, যেমন সোদপুরের বঙ্গোদয় কটন মিল, ওরিয়েন্টাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রি, শেখর আয়রন ওয়ার্কস ইত্যাদি। এভাবে কারখানার জমি বিক্রি সরকারি অনুমতি নিয়েও চলছে। জয় ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার পুনরুজ্জীবনের নামে কারখানার জমি বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছে সরকার। শুধু তাই নয়, সেই টাকার কতটা শিল্পের পুনরুজ্জীবনে ব্যয় হবে, সেটাও মালিকদের উপর ছেড়ে দিয়েছে। ২০০৫-০৬-এর সরকারি রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, বন্ধ কারখানা ও চালু কারখানার উদ্বৃত্ত জমিতে আবাসন তৈরির অনুমতি পেয়েছে মোট আরও ৬টি সংস্থা। এর মধ্যে ৩০০ একরের বেশি জমিতে আবাসন গড়ার অনুমতি পেয়েছে হিন্দুস্তান মোটর। কাঁকুড়গাছির কাছে স্মল টুলস্ কারখানা তুলে দিয়ে যখন শপিং মল নির্মাণ প্রায় শেষ হতে চলেছে, তখন সরকারি রিপোর্টে বলা হচ্ছে, স্মল টুলস্ পুনরুজ্জীবনের কাজ চলছে'' (সূত্র ঃ জয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প পুনর্গঠনের নামে প্রতারণা, নব দত্ত)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বন্ধ কারখানার মালিকদের প্রোমোটারি ব্যবসার জন্য জমির যোগানদার হচ্ছে সরকার, কিন্তু সেই জমি নতুন শিল্পস্থাপনের জন্য ব্যবহার করার কথা বললেই সরকার বলছে, আইনি অসুবিধা রয়েছে। এটাই তো প্রমাণ করে, সরকার মালিকদের প্রোমোটারি ব্যবসার সুযোগ করে দিতে কতটা বদ্ধপরিকর।

তাছাড়া, ১৮৯৪ সালে ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি করা যে আইন দিয়ে সরকার এখন সিঙ্গুরের চার ফসলি জমি জবরদখল করছে, একই আইন প্রয়োগ করে বন্ধ কারখানার জমি শিল্প স্থাপনের জন্য অধিগ্রহণ করতে বাধা কোথায় ? এসব মূল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অক্ষম সিপিএম নেতৃত্ব গোয়েবলসীয় কায়দায় 'ওরা উন্নয়ন বিরোধী', 'ওরা শিল্পবিরোধী' বলে তারস্বরে চিৎকার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। 'শিল্প আকাশে হয় না' এই কথা বলে আসল প্রশ্ন থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের অবস্থা

সিপিএমের মুখে 'শিল্পায়ন', 'শিল্প বিকাশ' ইত্যাদি কথাগুলো কত বড় ধাপ্পা, তা তাদের ৩০ বছরের শাসনই বলে দেয়। এজন্য রাজ্যের সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের চেহারাটা একটু সংক্ষেপে দেখে নেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত কারখানার সংখ্যা ১১,২১৩টি। এ সব কারখানায় কাজ করেন ৯,০৫,০০০ জন। নথিভুক্ত কয়লাখনির সংখ্যা ১০৫টি, কাজ করেন ৯৭,০০০ জন। শ্রমনিবিড় পাটশিল্পের মিলের সংখ্যা ৫৯টি।

এর মধ্যে ৫টি কেন্দ্রীয় সরকার, ১টি রাজ্য সরকার, ২২টি ব্যক্তিমালিকানাধীন ও ২১টি লিজ বা সাবলিজে আছে। এসব কারখানায় কাজ করেন দুই লক্ষাধিক শ্রমিক। বয়নবস্ত্র শিল্পের সংখ্যা ৩৭টি। এর মধ্যে ১৯টি ব্যক্তিমালিকানাধীন, রাজ্য সরকারের অধীনে আছে ৬টি ও ১২টি আছে ন্যাশনাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের অধীনে। কাজ করেন ৪০ হাজারের কিছু বেশি শ্রমিক। উত্তরবঙ্গে মূলত দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় রেজিস্টার্ড চা বাগানের মোট সংখ্যা ২৭৭টি। এখানে কাজ করেন আড়াই লক্ষ শ্রমিক। এছাড়াও উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি সহ কোচবিহার জেলায় ১০-১৫ একর জমি নিয়ে গড়ে উঠেছে অসংখ্য ছোট ছোট চা বাগান। ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার সংখ্যা ৪ হাজারের বেশি এবং এখানে নিযুক্ত আছে ৩.৫ লক্ষের বেশি শ্রমিক। এছাড়াও আছে কাগজ শিল্প, রবার শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, কাঁচ, মুদ্রণ শিল্প, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি। এ সমস্ত কারখানাতেও কাজ করেন লক্ষাধিক শ্রমিক। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য ক্ষুদ্রশিল্প। এই হল রাজ্যের এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত শিল্পের মোটামুটি বাস্তব চেহারা।

পাটশিল্প

কোন সরকার, যারা সত্যিই শিল্পোন্নয়ন ও তৎসংক্রান্ত কর্মসংস্থানকে গুরুত্ব দিতে চায়, তাদের কাজ কী হবে ? তারা মানুষকে, বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত ও গরিব ঘরের মানুষকে কাজ দেওয়ার জন্য শ্রমনিবিড় শিল্পের যত্ন নেবে (অর্থাৎ যেখানে যন্ত্রের চেয়ে শ্রমিক বেশি থাকে)। এটাই স্বাভাবিক। কারণ, এইসব শ্রমনিবিড় শিল্পে মূলত কাজ করেন অদক্ষ শ্রমিকেরা এবং তারা সংখ্যায়ও প্রচুর। রাজ্যের পাটশিল্প এক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য। এই শিল্পের যত্ন নিলে এর এমন ভগ্নদশা হওয়ার কথা ছিল না এবং তাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের এক নোটে বলা হয়েছিল— '' পাটের প্রকৃতিজাত গুণ, ব্যবহারযোগ্যতা ও প্রকৃতি বিলীনতার চরিত্রের জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য বর্তমানে পাটশিল্পের সামনে বিকাশের ক্রমবর্ধমান সুযোগ উপস্থিত হয়েছে।'' ঐ নোটে আরও বলা হয়েছে— ''ভারতীয় অর্থনীতিতে পাটশিল্প একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে''। অসাধু মালিকেরা সরকারের কাছ থেকে নানাবিধ সুযোগসুবিধা আদায় করার জন্য চটশিল্পকে যতই চিররুগ্ন হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করুক না কেন, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং বিভিন্ন দেশে সিন্থেটিক বর্জনের ফলে বিশ্ববাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়ছে। '৯৮-'৯৯ সালে যেখানে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হয়েছে ১৭.৬৭ লক্ষ টন, ২০০০-০১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.১৩ লক্ষ টন (Labour in West Bengal, 2002)। বছরে ৪ হাজার কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রা পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে আদায় হয়। দেশিয় বাজারেও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে। এ হেন ক্রমবর্ধমান চাহিদাযুক্ত বিকল্পহীন পাটজাত পণ্যের উৎপাদনের জন্য চটশিল্পের তো ব্যাপক সম্প্রসারণ হওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না কেন ? দায়ী কে ? শিল্পায়নের তথাকথিত চ্যাম্পিয়ন রাজ্য সরকারের এক্ষেত্রে ভূমিকা কী ?

বর্তমানে রাজ্যের ৫৯টি চটকলের মধ্যে ২৭টি আছে বি এফ আই আর-এ।

চটকলগুলির জমি ও গোডাউন ভাড়া দেওয়া ও বিক্রি চলছে অবাধে। কুলিলাইন বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। লিজ ও সাবলিজে থাকা চটকলগুলির অবস্থা ভয়াবহ। লিজ ও সাবলিজে নেওয়া চটকলের ক্ষণস্থায়ী মালিকরা এই শিল্পের উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে চটজলদি অতিরিক্ত মুনাফা পেতে মরিয়া। এদের অধিকাংশ কাঁচা পাটের সরবরাহকারী। চটকলের সেলাই বিভাগে একসময় ৪০ হাজার মহিলা শ্রমিক কাজ করতেন। বর্তমানে এক হাজার মহিলা শ্রমিকেরও সন্ধান পাওয়া যাবে না। একশ্রেণীর ফড়ে দালাল চরিত্রের মালিকরা অধিক মুনাফার লোভে এই শিল্পকে রুগ্ন ঘোষণা করে জমি কেনাবেচার চক্রে জড়িত। এরা এখন উৎসাহী রিয়েল এস্টেট বা প্রোমোটারি ব্যবসায়। এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা।

সিপিএম সরকারের আমলেই ৮০-র দশক জুড়ে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত চটশিল্পেও একদল প্রোমোটার শাসকদলের ছত্রছায়ায় চটকলগুলির মালিক হয়ে বসেছে। এরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এক একটি চটকল লকআউট করে দিয়ে ব্যাপকহারে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। গত ১৫ বছরে এই শিল্পে প্রায় ৭০ হাজার কর্মীসঙ্কোচন হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে— বিগত বছরগুলিতে ১৫০০ শ্রমিক অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছে, ৭৫ জন শ্রমিক দুঃসময়ের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। শুধুমাত্র টিটাগড় জুটমিলেই নারী-শিশু সহ শ্রমিক পরিবারের ৩৫ জন মারা গিয়েছে। এইভাবে এরাজ্যে মৃত শ্রমিকদের তালিকা ক্রমশই দীর্ঘ হচ্ছে। শ্রমিকদের পি এফ-গ্র্যাচুইটির কোটি কোটি টাকা মেরে দিয়ে মালিকেরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিপিএমের শ্রমিক ফ্রন্টের নেতারা হল এদের মদতদাতা। সিপিএম সরকারেরও এই হল ভূমিকা। আর এই ভূমিকার ফলেই তিরিশ বছর আগে রাজ্যের ১০৩টি চটকলের জায়গায় বর্তমানে সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে বাস্তবে মাত্র ৩২টি। রাজ্য সরকারের শিল্পবান্ধব চেহারার এ হল সামান্য নমুনা।

মালিকেরা রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সহায়তায় কেমন করে কোম্পানির স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে শ্যামনগরের ডানবার কটন মিল তার ভয়াবহ উদাহরণ। ''শ্যামনগরের ডানবার ও অন্নপূর্ণা কটন মিল ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সেন্টিমেন্ট বলেই গণ্য হোত। তাই বেসরকারি উদ্যোগী ধরে কারখানা দু'টি খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ২০০১ সালে সরকার মোট ৮ কোটি টাকা অনুদান দেন। তার মধ্যে ডানবারের জন্যই ছেড়ে দেওয়া হল ৭ কোটি টাকা।

... শিল্পপতি নামধারী যে ব্যক্তিকে ধরে এনেছিল সরকার ... ওই ব্যক্তি চার কোটি টাকার কাপড় বের করে নেয়।... কারখানা চত্বরের দামী ও দুষ্প্রাপ্য গাছগাছালিও কেটে সাফ করে ফেলা হয়'' (বর্তমান, ১২-১-০৭)। সরকারের মদতে মালিকদের এই লুণ্ঠনের কাহিনী সর্বত্র।

চা শিল্প

চা-শিল্পেও একই দুঃখের কাহিনী। উত্তরবঙ্গের ৩০টিরও বেশি চা-বাগান লক আউটের কবলে। ডুয়ার্সের ১৪টি চা-বাগান বন্ধ। এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। হাজার হাজার শ্রমিক

ছাঁটাই চলছে অবাধে। অনাহার, অপুষ্টি, ডায়েরিয়া, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগে ন্যূনতম চিকিৎসা না পেয়ে শ্রমিক পরিবারগুলি অসহায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ক্ষুধার জ্বালায় অনেকে আত্মহত্যা করেছে। একশ্রেণীর ফাটকাবাজ চিরাচরিত নিলামের পরিবর্তে খোলাবাজারেই কম দামে ক্ষুদ্র চা-বাগিচা মালিকদের চা পাতা বিক্রি করতে বাধ্য করছে। হিন্দুস্তান লিভার লিমিটেড বা টাটা টি-র মতো সংস্থা চা উৎপাদনের তুলনায় বিপণনে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করেছে। বাগিচা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে মালিকদের অবাধ লুটপাট ও শোষণ। এ রাজ্যে চা-বাগিচা শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম। কেরল, তামিলনাড়ু, এমনকী আসামের চা-বাগিচা শ্রমিকদের মজুরি পশ্চিমবঙ্গের থেকে বেশি। অথচ এখানে শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও চায়ের দাম সবচেয়ে বেশি।

পাট ও চা শিল্পের কথা আলাদা করে বলা হল এই কারণে যে, এইসব শিল্পের এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল না। এদের বাজার এখনও ছিল। শ্রমের উৎপাদনশীলতা ক্রমাগত বাড়লেও এইসব শ্রমনিবিড় শিল্পে মালিকদের চটজলদি অতি মুনাফার লোভ ও সেক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ মদত শিল্পগুলিকে ধ্বংস হতেই সাহায্য করেছে। ফলে লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ হারিয়েছে এবং অন্যেরা ছাঁটাই হওয়ার দিন গুনছে। গরিব মানুষকে কাজ দেওয়ার নাম করে যাঁরা 'শিল্পায়নে'র আকাশকুসুম স্বপ্ন ফেরি করছেন, তাঁরা এইসব শিল্পের উপযুক্ত যত্ন নিতে মালিকদের বাধ্য করতে পারলেন না কেন ? বাধা ছিল কোথায় ?

শ্রমিকদের ভয়াবহ অবস্থা

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী সঙ্কট ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের মালিক তোষণকারী নীতি — এই দুইয়ে মিলে পশ্চিমবঙ্গের যে শিল্প পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তা এককথায় ভয়াবহ। গত ১৮ বছরের হিসাবে কাজ পেয়েছেন মাত্র ৪৩ হাজার ৩৪৯ জন। বছরে আড়াই হাজারেরও কম। কাজ হারিয়েছেন ১২ লক্ষ ৭৯ হাজার (ন্যাশনাল লেবার সার্ভে, '০৩)। বাস্তবে কর্মচ্যুতির সংখ্যা আরও অনেক বেশি। ৮টি বন্ধ সূতাকলে ১০ হাজার শ্রমিক কর্মচ্যুত। 'এই রাজ্যে ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে বন্ধ কারখানার সংখ্যা ২৯ হাজার। এখানে কর্মহীনের সংখ্যা ৪ লক্ষ' (সংবাদ প্রতিদিন, ১৭-১০-০৫)।

রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন সরকারি সংস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রতি কী ধরনের ব্যবহার করা হচ্ছে ?

''১৯৯৯ সালে রাজ্য সরকার মাত্র ৫০ লক্ষ টাকায় কিনেছিল ন্যাশনাল ট্যানারি। তিন বছর পর ছাঁটাই করা হয়েছে ৪০০ শ্রমিক। এদের মধ্যে ১০৭ জন আত্মহত্যা করে বেঁচে থাকার দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে নিজেদের মুক্তি দিয়েছে।

''বেণী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কাজ হারানো ১৩০৬ জন শ্রমিকের মধ্যে ৪০০ জন আত্মহত্যা করেছে, না খেতে পেয়ে মারাও গিয়েছে। মেটাল বক্স-এর কাজ হারানো ২৬০০ জনের মধ্যে ৩৫০ জন অনাহারে মৃত, আত্মহত্যা করেছে ১০ জন'' (সংবাদ প্রতিদিন, ১-৮-০৬)।

রাজ্য 'শিল্পায়ন পরিকল্পনা'র অন্যতম সারথী নিরুপম সেনের বর্ধমান জেলার হাল কী ? সিপিএমের তাত্ত্বিক মুখপত্র লিখছে, ''আমাদের সমীক্ষায় বর্ধমান জেলার ২০০টি কারখানার মধ্যে অন্তত সরকারি ও বেসরকারি ৪০টি কারখানা উদারনীতির ধাক্কায় রুগ্ন অথবা বন্ধ হয়ে গেছে। .... ১৩টি কারখানাতে কাজ করত ২,৮৭,৯৭৮ জন শ্রমিক। বর্তমানে কাজ করেন ১,৬৪,৮০৬ জন। সুতরাং স্থায়ী কাজের শ্রমিক কমেছে ১,২৩,৮৭৮ জন। ... বন্ধ হওয়া ৫৪টি কারখানায় মোট ৪২,৮১২ জন শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন'' (মার্কসবাদী পথ, নভেম্বর, '০৩)। এই তথ্যকে অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। এ খোদ সিপিএমের মুখপত্রের নিজস্ব সমীক্ষা। ফলে, রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতির ভয়াবহ অবস্থা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। অপর একটি হিসাব বলছে, এ রাজ্যে সংগঠিত-অসংগঠিত মিলিয়ে বন্ধ কারখানার সংখ্যা ৫৬ হাজার। ছাঁটাই ১৫ লক্ষ শ্রমিক। সিপিএম নেতারা ক্ষমতায় আছেন ৩০ বছর। পরিস্থিতির দায়ভাগ তারা অস্বীকার করতে পারেন ? নাকি এই কালা রেকর্ডকে চাপা দিতেই এখন শিল্পায়নের জিগির তুলছেন ?

ভয়াবহ এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে সিপিএম নেতা-মন্ত্রীরা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কাছ থেকে ধার করা এক তত্ত্ব আমদানি করেছেন। তাঁরা বলছেন — ইন্ডাস্ট্রি দু'ধরনের। একটা হল সানসেট ইন্ডাস্ট্রি (অস্তমিত শিল্প) ও অন্যটি হল সানরাইজ ইন্ডাস্ট্রি (উদীয়মান শিল্প)। সিপিএমের মনোভাব হল, সানসেট ইন্ডাস্ট্রির কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সেগুলো বন্ধ হবেই, সেখানে শ্রমিক ছাঁটাই চলবেই, সেখানে শ্রমিক আন্দোলন করতে যাওয়া মানেই সর্বনাশ। তার চেয়ে যতদিন চলে চলুক, মালিক যতদিন পারে চালাক, ছাঁটাই করলেও তো দু-চারজন কাজ পাবে — তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল, অনর্থক অশান্তি করে লাভ নেই। আর এই শিল্প বাঁচাতে সরকারেরও কোন ভূমিকা নেই। রাজ্যের পাট, চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, সুতাকল, কাপড়কল ইত্যাদি চিরাচরিত শিল্প যেখানে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক কাজ করে সেগুলি সম্পর্কে এই ওদের দৃষ্টিভঙ্গি। তাই মালিকরা যখন এই সব শিল্পে বল্গাহীন আক্রমণ নামিয়ে আনে, তখন রাজ্য সরকার শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে তার সশস্ত্র দমনযন্ত্র নিয়ে মালিকের পাশে দাঁড়ায়।

সিপিএমের 'উদীয়মান শিল্পে'র হাল

সিপিএম সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হল, সানসেট ইন্ডাস্ট্রির কথা না ভেবে সানরাইজ ইন্ডাস্ট্রির দিকেই লক্ষ্য দেওয়া দরকার, এখানেই নাকি রয়েছে শিল্পায়নের চাবিকাঠি। তা বুদ্ধবাবুদের তৈরি এই সানরাইজ ইন্ডাস্ট্রির চেহারা কেমন ? কী ধরনের কলকারখানা ওরা প্রতিষ্ঠা করছেন ? এ পর্যন্ত লোহা ও ইস্পাত শিল্পে ১৭৫টি ইউনিটে বিনিয়োগ হয়েছে। বিনিয়োগের পরিমাণ ৭৩৫৯.০৯ কোটি টাকা। এর বেশিরভাগটাই স্টিল ইনগট ও স্পঞ্জ-আয়রন ইউনিট। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলায় ব্যাঙের ছাতার মতো এইসব কারখানা গড়ে উঠেছে। এর উৎপাদন পদ্ধতি মান্ধাতা আমলের, মজুরি অত্যন্ত কম এবং শ্রমআইনের কোনও তোয়াক্কা এসব জায়গায় হয় না। বাঁকুড়ার বড়জোড়া, মেজিয়া, ছাতনা এবং বিষ্ণুপুর

অঞ্চলে এ ধরনের অজস্র কারখানা গড়ে উঠেছে। বলাগড়, গঙ্গাজলঘাটি, ঘুটগোড়িয়া, সাহারাজোড়া এবং নবান্দায় আরও কিছু তৈরি হওয়ার পথে। বড়জোড়া-হাটআগুড়িয়া এলাকার গাছপালা, মাঠঘাট, বাড়িঘর সব কালো হয়ে গিয়েছে কারখানার চিমনি থেকে নির্গত কার্বন মনোক্সাইড মিশ্রিত ধুলো ও ধোঁয়ায়। কালো আস্তরণ পড়েছে পুকুরের জলে। এই কারখানাগুলিতে কর্মসংস্থানের বিশেষ কোনও সুযোগ নেই। দৈনিক ৫০-৬০ টাকা মজুরিতে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কালিমাখা ভূতের চেহারা নিয়ে ঘরে ফেরে শ্রমিকরা। এক একটা কারখানায় এই ধরনের কাজ জোটে বড় জোর ৮০-৯০ জন শ্রমিকের। অথচ এইসব কারখানার জন্য রাজ্য সরকার প্রচুর ভর্তুকি সহ ঋণের ব্যবস্থা করেছে, কম দামে বিদ্যুৎ দিচ্ছে এবং অন্যান্য হাজারো ধরনের ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮-৮-০৫)। এই কারখানাগুলি হয়েছে মূলত চীনে আগামী অলিম্পিকে নির্মাণ কাজের অর্ডার সাপ্লাইয়ের জন্য। পশ্চিমের দেশে এই ধরনের লোহা তৈরির কারখানা করতেই দেওয়া হয় না পরিবেশ দূষণের জন্য। এই শিল্পের আয়ুও বেশি নয়।

তথ্যপ্রযুক্তি

পশ্চিমবঙ্গের তথ্যপ্রযুক্তি (আই টি)শিল্প নিয়ে সরকার ও মালিকশ্রেণী খুব হৈ চৈ করছে। এই শিল্পের জন্য বুদ্ধদেববাবুরা যে ঢালাও সুবিধার বন্দোবস্ত করেছেন, তা হল — (ক) এই শিল্পে লগ্নির বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনরকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি। ফলে এই ক্ষেত্রটি 'উদারনীতি' গ্রহণের আগে থেকেই তথাকথিত 'মুক্তবাজার'-এর নিয়মে গড়ে উঠেছে ; (খ) তথ্যপ্রযুক্তির সংস্থাগুলিকে রপ্তানির উপর কর ছাড় দেওয়া হয়েছে ২০১০ সাল পর্যন্ত ; (গ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

এইসব বিশেষ সুবিধা পেয়ে রাজ্যে এ পর্যন্ত ১৫২টি তথ্যপ্রযুক্তি এবং ২৩টি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর কোম্পানি ব্যবসা চালাচ্ছে। জন্ম থেকেই এই ক্ষেত্র সঙ্কটের মুখোমুখি। এই ১৭৫টি সংস্থার মধ্যে ৪৫ শতাংশ কোনও লাভই করেনি। ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা লাভ করেছে ১১ শতাংশ সংস্থা। ১০ কোটি বা তারও বেশি লাভ করেছে মাত্র তিনটি সংস্থা। কোম্পানিগুলির মোট মুনাফার পরিমাণ ১৮৫ কোটি টাকা (২০০৪-০৫-এর আর্থিক সমীক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

এই শিল্পের বাজার মূলত পশ্চিমের পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি থেকে পাঠানো কাজের (আউটসোর্সিং) উপর নির্ভরশীল। এইসব দেশের সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক কাজের যে বরাত পাওয়া যাচ্ছে, তাই মূলত এর বাজার। বিদেশের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ভারতে অনেক কম মজুরিতে কাজ করাতে পারছে বলেই এখানে এসে হাজির হচ্ছে, বা এখানকার কোম্পানিগুলিকে কাজের বরাত দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমেরিকা সহ বাইরের অন্যান্য দেশে আই টি-তে ঘোর সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তাছাড়া বুনিয়াদি শিল্পের যদি বিকাশ না ঘটে, তবে তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রগতি হতে পারে না। আবার, বাইরের কাজ ভারতে আসা যদি বন্ধ হয়ে

যায়, বা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি যদি অন্যত্র আরও সস্তায় তাদের কাজ করিয়ে নিতে পারে, তবে বুদ্ধদেববাবুদের সাধের তথপ্রযুক্তি ক্ষেত্র যে মুখ থুবড়ে পড়বে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যেই আমেরিকার ডালাসে অবস্থিত এভারেস্ট গ্রুপের এক ডিরেক্টরের মন্তব্য সংবাদপত্রে বেরিয়েছে। তিনি বলেছেন, ''The offshoring industry may see a bottleneck as early as 2007 as companies are rethinking their location strategies because of increasing property and labour costs.'' (Times of India, 28-12-06)। অর্থাৎ বিদেশের কাজের উপর নির্ভর করে যেসব সংস্থা এখন চলছে, ২০০৭ সালেই তাদের মুনাফা কমতে পারে, এই ভেবে তারা অন্য দেশে সংস্থা সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছে।

যে সমস্ত কোম্পানি বিদেশ থেকে এই সমস্ত বরাত ধরে আনছে তারা কী ধরনের আচরণ করে শ্রমিক-কর্মচারীদের সাথে ? ভি ভি গিরি ন্যাশনাল লেবার ইন্সটিটিউটের একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে — ''তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে শ্রম পরিস্থিতি উনিশ শতকের জেলখানার মতো। কর্মচারীদের মধ্যে যাতে কোনভাবে ইউনিয়ন গড়ার মানসিকতা তৈরি না হয়, তার জন্য সারাক্ষণ সেখানে নজর রাখা হয়। সাড়ে তিন লক্ষ (সারা দেশে) কর্মী নিয়ে কাজ করলেও তাঁদের ছোট্ট একটা অংশ স্থায়ী কর্মচারী এবং বাকি সকলকেই অস্থায়ী এবং পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬-১০-০৩)। এখানে দিনে তিনটে ভুল হলে জুটবে সতর্কীকরণ এবং শূন্য পয়েন্ট, এবং তিনবার শূন্য পয়েন্ট পেলে বরখাস্তের নোটিস মিলতে পারে। বহু কোম্পানি তাদের কলসেন্টারের কর্মীদের মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা দিতে অস্বীকার করে। রাজ্য সরকার এই তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প নিয়ে প্রায়ই গর্ব করে থাকে। একে অত্যাবশ্যক পরিষেবা হিসাবে গণ্য করে জাতীয় ছুটির দিনেও কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখানে শ্রমিকদের শ্রমসময়ের কোনও নির্দিষ্ট নির্ঘন্ট নেই। যেহেতু বিদেশি গ্রাহকদের সুবিধা মতো কাজ করতে হয়, তাই এখানে ২৪ ঘন্টাই কাজের সময়।

এসবের ফলে তথ্যপ্রযুক্তির কর্মচারীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা উপসর্গ। উচ্চ রক্তচাপ, নিরন্তর মাথাযন্ত্রণা, স্নায়ুবৈকল্য প্রভৃতি শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিকতা থেকে বিচ্ছিন্নতার ফলে চূড়ান্ত মানসিক অবসাদ। এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে — ''জ্বর, ঘাড়ে ফিক ব্যথা, হুপিং কাশি নিয়ে অক্লান্ত খাটতে হচ্ছে বারো-তেরো ঘন্টা কনকনে এসিতে, কারণ চুক্তির নির্দিষ্ট টাকায় যা বলবে তাই করতে হবে। এটা কী ? বন্ডেড লেবার ছাড়া ?'' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩-১১-০৫)

এই শিল্পের মালিকদের বিল্ডিং রুল্‌স থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, বাধ্যতামূলক বিদ্যুৎ ছাঁটাই থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এবং পরিবেশগত বাধানিষেধের ব্যাপারে নিজেরাই নিজেদের শংসাপত্র দেবে, এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইসব ব্যবস্থায় আই বি এম গ্লোবাল, টাটা কনসালটেন্সি ইত্যাদি সংস্থা যে বেজায় খুশি, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'শিল্পস্থাপনে উদগ্রীব' সিপিএম সরকারের দীর্ঘ শাসনে — (ক) এখনও বাজার রয়েছে এমন শ্রমনিবিড় শিল্প, বিশেষ করে পাট ও চা শিল্পকে চাঙ্গা

করার বদলে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে ; (খ) পরিবেশগত বিধিনিষেধের কারণে যে সমস্ত শিল্প পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলির শাসকরা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে, সেইরকম কিছু ভয়ঙ্কর পরিবেশ ও স্বাস্থ্য দূষণকারী শিল্প বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় এনে জড়ো করা হয়েছে, যার কর্মসংস্থানের ক্ষমতা নেই বললেই চলে ; (গ) বিদেশের আউটসোর্সিং-এর উপর নির্ভরশীল মূলত কলসেন্টার নির্ভর তথ্যপ্রযুক্তি নামক শিল্পের জন্ম দেওয়া হয়েছে — সব মিলিয়ে সাকুল্যে যার কর্মীসংখ্যা এ রাজ্যে ১৫ হাজার ; (ঘ) সংগঠিত শিল্পে কাজ হারিয়েছেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, পাশাপাশি ৫,৬০,৩৪০টি ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প বন্ধ হওয়ার মুখে (Report, West Bengal Labour Dept., 2003)। সব মিলিয়ে এই হল রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি ও কর্মসংস্থানের চেহারা।

এদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাজ্যের বেকারবাহিনী। বাড়তে বাড়তে তা এখন এক কোটি ছুঁই ছুঁই। এটা শুধু নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা। শহর ও গ্রামাঞ্চলের অনথিভুক্ত বেকার, অর্ধবেকারের সংখ্যা হিসাবে আনলে এর পরিমাণ বেড়ে যাবে বহুগুণ। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনমনে প্রশ্ন উঠছে — কেন এত বেকারি ? এদের কর্মসংস্থানের কী উপায় হবে ? জনগণের স্বাভাবিক এই উদ্বেগকে দেশি-বিদেশি পুঁজির ও নিজেদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে সিপিএম। তাই বেকারদের কাজ দেওয়ার নাম করে তারস্বরে শিল্পায়নের জিগির তোলা হয়েছে।

শিল্প ও কর্মসংস্থানের নামে মিথ্যাচার

আমরা আগেই বলেছি, রাজ্যে যদি কোথাও শিল্প হয়, তাহলে আপত্তি কেন হবে ? কিন্তু যেভাবে বুদ্ধদেববাবুরা এই শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে বেকারদের সামনে 'কর্মসংস্থানের বন্ধ দুয়ার খুলে যাবে', 'পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির হাল ফিরে যাবে' বলে দাবি করছেন, সেটা আমাদের মতে একটি পরিকল্পিত মিথ্যাচার। সিপিএম সরকারের বহুকথিত টাটা কোম্পানির 'ছোট মোটরগাড়ির কারখানা'র কথাই ধরা যাক। এই কারখানায় 'হাজার হাজার লোকের কাজ হবে', 'অর্থনীতির চেহারা বদলে যাবে' বলে সরকার যে মিথ্যার ফানুসটি উড়িয়েছিল, সেটি ইতিমধ্যেই ফেঁসে গেছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সকল শিল্প সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। কোন কোম্পানিতে ব্যবহৃত প্রযুক্তির ধরন তার মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। একটা বিশেষ সময়ে সেই বিশেষ পণ্য উৎপাদনকারী চলতি সংস্থাগুলি যে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে, নতুন কোম্পানির ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে হয় তার সমমানের বা তার থেকে উন্নত হতেই হবে। না হলে, তীব্র প্রতিযোগিতার বাজারে নতুন কোম্পানি দাঁড়াতেই পারবে না। এ হচ্ছে মুনাফাচালিত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাথমিক কথা। এই কারণেই মার্কস বলেছিলেন, উৎপাদন যন্ত্রের ক্রমাগত বিকাশ না ঘটিয়ে পুঁজিবাদ বাঁচতে পারে না। টাটার ক্ষেত্রেও একই কথা। বিশ্বের অন্যান্য ছোটগাড়ির প্রস্তুতকারক সংস্থার সাথে তীব্র প্রতিযোগিতা করেই টাটাকে মোটরগাড়ির বাজার ধরতে হবে। ফলে নতুন এই কোম্পানির উৎপাদন খরচ কমাবার জন্য একদিকে সরকারকে চাপ দিয়ে নানা ধরনের কর ছাড়ের ব্যবস্থা করা এবং অন্যদিকে সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহার করা

— এই দুটো পদ্ধতি গ্রহণ ছাড়া কোনও উপায় নেই। আর প্রযুক্তিপ্রধান শিল্পের অর্থই হল, সেখানে শ্রমিক লাগবে কম এবং যাদের নিয়োগও করা হবে, তাদের এই প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। এখন এই দক্ষতা তো মানুষকে বাজার থেকে কিনতে হবে। ধরুন, একজন কম্পিউটার চালাবার দক্ষ শ্রমিক দরকার। এই দক্ষতা বাজার থেকে ২৫-৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে কিনতে না পারলে পাওয়া যাবে না। ফলে কাজ পাবে মুষ্টিমেয় মানুষ এবং তারাও মূলত উচ্চবিত্ত পরিবারের। এরা কাজ পেলে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বুদ্ধদেববাবুরা যেভাবে ঢালাও কর্মসংস্থানের কথা বলছেন, সেটা সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে হলদিয়া পেট্রোকেমের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সিপিএম নেতারা সেখানে লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করেছিলেন, বাস্তবে সেখানে কত লোক কাজ পেয়েছে ? এই শিল্পে বিনিয়োগ হয়েছিল ৫১৭০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে মাত্র ৬০০ জনের। অর্থাৎ প্রতি সাড়ে আট কোটি টাকা বিনিয়োগে একজনের কর্মসংস্থান হয়েছে (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ওয়েবসাইট)। এই কঠিন সত্যের মুখে পড়লেই তাঁরা বলেন, অনুসারী শিল্পের কথা। সেখানকার কর্মসংস্থান কেমন ? যেমন, হলদিয়া পেট্রোকেম-এর অনুসারী শিল্প পূর্বমেদিনীপুরে ছোট-মাঝারি মিলিয়ে রয়েছে ১০টি। তার মোট শ্রমিক সংখ্যা ৭৬১, অর্থাৎ কারখানা পিছু ৭৬.১ জন। পশ্চিম মেদিনীপুরে ছোট-মাঝারি মিলিয়ে অনুসারী শিল্প আছে ৭টি। তার মোট শ্রমিক সংখ্যা ২১২ জন, অর্থাৎ কারখানা পিছু ৩০.৩ জন। নিশ্চয়ই খুব একটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।

এই পরিস্থিতিতে কৃষিজমি থেকে হাজার হাজার চাষী পরিবারকে উচ্ছেদ করা হলে, তারা কোথায় যাবে ? কী কাজ পাবে ? সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও কৃষক নেতা বিনয় কোঙার জানিয়েছেন, উপনগরী হলে ২ জন দারোয়ান লাগবে। জলের পাম্প চালাবার লোক লাগবে। ইলেকট্রিকের কাজ, কাঠের কাজ, মেরামতির জন্য লোক লাগবে। কয়েকজন সব্জির ভেন্ডারও কাজ পাবে। ... এছাড়া কাজের লোক লাগবে।

ভূমিসংস্কার মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, উপনগরীতে বাড়ির কাজের লোক দরকার। ধোপা, নাপিত, সব্জি বিক্রেতা ছাড়াও চৌকিদার, মালি হিসাবে জমি হারানো চাষিরা রক্ষণাবেক্ষণের এই সব কাজে তাদের বাড়িতে রোজগারের সুযোগ পেয়ে যাবেন।

দুই নেতার চিন্তাভাবনায় কি অপূর্ব মিল ! এঁরা কেউ কিন্তু ভুলেও বলছেন না, উচ্ছেদ হয়ে যাওয়া চাষী-মজুরদের কাজ দেওয়া হবে মিল-ফ্যাক্টরিতে। কারণ, ওঁরা ভাল করেই জানেন, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় উচ্ছেদ হওয়া কৃষক-খেতমজুর-বর্গাদার এবং শহরের কর্মচ্যুত শ্রমিক বা বিশাল বেকারবাহিনীকে ওঁরা কাজ দিতে পারবেন না। যে টাটার হাত ধরে রাজ্যে শিল্পোন্নয়নের নতুন জোয়ার আসবে বলে বুদ্ধদেববাবুরা দাবি করছেন, সেই টাটার টিসকো ও টেলকোর ছবিটা কেমন ? খনি সহ টিসকোতে একসময় কাজ করতেন ৭৮ হাজার শ্রমিক, তার মধ্যে ৩৬ হাজারকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে। টেলকোতে কাজ করতেন ২২ হাজার শ্রমিক, তার ১৫ হাজার ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সদ্য সরকার যখন প্রচার করছিল যে, সিঙ্গুরে যাঁরা উচ্ছেদ হবেন তাঁরা টাটার মোটরগাড়ি কারখানায় কাজ পাবেন,

টাটারা খুব ভাল শিল্পমালিক; ঠিক তখনই টাটার কর্তারা জানিয়ে দেন, টাটা কারখানায় কাউকে কাজ দেওয়া যাবে না, চাকরির নিশ্চয়তা টাটারা দেবে না। সিঙ্গুরে কত মানুষ জমিচ্যুত হবে ? নানা হিসাব ও সরকারি বক্তব্যও বলছে, ১০০০ একরে ৮ থেকে ১০ হাজার লোক জমিচ্যুত হচ্ছে। যদি ধরে নেওয়া যায়, এদের মধ্যে চাষাবাদের সঙ্গে যুক্ত নন এমন ৩ থেকে ৪ হাজার জন জমির মালিক জমি ছেড়ে দিতে চান, তাঁরা তা বেচে দিলেন। বাকি ৫ থেকে ৬ হাজার জন লোক যারা চাষের ওপর নির্ভরশীল এবং তাদের সঙ্গে প্রায় হাজার জন বর্গাদার ও হাজার জন কৃষিমজুরের সংখ্যা যোগ করলে ঐ জমির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ থেকে ৮ হাজার। এদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া মানে ৭ থেকে ৮ হাজার মানুষকে বৃত্তিচ্যুত করা, জমিচ্যুত ও বাস্তুচ্যুত করা। একেই সরকার 'উন্নয়ন' বলছে ! টাটার কারখানা কতজনকে চাকরি দেবে ? আগেই দেখানো হয়েছে, গাড়ির বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে টাটার গাড়ির কারখানাতেও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়া চালু করা হবে, যেখানে কাজের লোক লাগবে অত্যন্ত কম — ২৫০ থেকে খুব বেশি হলে ৫০০ জন। ৮ থেকে ১০ হাজার লোককে জমিচ্যুত ও বৃত্তিচ্যুত করে ৫০০ জনের চাকরি ! ৫০০ জনকে যদি মোটা টাকার মাইনেও দেওয়া হয়, তাতেও কি বাজার বাড়বে ? ৮ থেকে ১০ হাজার মানুষের যে বাজার ছিল, সেটা কি ৫০০ জনকে দিয়ে বাড়ানো যায় ?

সিপিএম নেতারা বলছেন, চাষীর ছেলে কি চাষীই থাকবে ? বর্গাদার, খেতমজুরের ছেলে কি চিরকাল তাই থাকবে ? অনেকেরই হয়তো স্মরণে আছে, ৯০-এর দশকে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি শিক্ষা পুনরায় চালু করার দাবিতে আমরা যখন শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সকল অংশের মানুষকে জড়িত করে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম, তখন এই সিপিএম নেতারাই বলেছিলেন, চাষীর ছেলের আবার ইংরাজি শেখার দরকার কী ? এই হচ্ছে সিপিএমের চরিত্র। যখন যা বললে স্বার্থসিদ্ধি হয়, তখন তেমন বলা। এখন চাষীর ছেলে চিরকাল চাষী থাকবে কিনা বলে যে প্রশ্নটা তাঁরা তুলছেন, তার জবাব একটাই — সরকার ও নেতারা বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে দিন, বিকল্প কাজ দেখিয়ে দিন, জমি থেকে যতটুকু আয় হয়, তার চেয়ে বেশি আয়ের সংস্থান করে দিন, চাষীর ঘরের ছেলেমেয়েরা জমি ছেড়ে দলে দলে চলে আসবে। কিন্তু কোথায় বিকল্প কাজ ? গোটা দেশ জুড়েই তো অধুনা কেবল ক্লোজার-লকআউট আর ছাঁটাইয়ের খবর। আজ দেশের অর্থনীতির চেহারাটা যদি এমন হত যে, দেশের শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে, তাকে ভিত্তি করে শিল্পপণ্যের বিক্রির বাজার বাড়ছে, ফলে শহর ও শহরতলিতে চালু শিল্পগুলির বিকাশ ঘটছে, পাশাপাশি নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠছে, এবং এইসব শিল্পে কাজ করার জন্য প্রচুর সংখ্যায় শ্রমিক-কর্মচারীর চাহিদা দেখা দিচ্ছে, যার ফলে সেখানে কাজ পাচ্ছে গ্রামীণ বা কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ও উচ্ছেদ হওয়া মানুষ বা ভূমিহীন বর্গাদার-খেতমজুররা, তাহলে একটা কথা ছিল। কিন্তু এখনকার অবস্থা কি এ'রকম ? 'কৃষি থেকে শিল্পে উত্তরণে'র মধ্য দিয়ে গ্রামীণ কৃষিজীবনের উন্নতির যে কথা সিপিএম প্রচার করছে, তার কোনও বাস্তব ভিত্তিই নেই। বরং ঘটছে ঠিক উল্টো। গ্রাম থেকে দলে

দলে মানুষ কাজের আশায় শহরে ছুটছে, ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু কাজ কোথায় ? এদের মধ্যে ক'জন শ্রমিকের কাজ হচ্ছে ? শহরের ফুটপাত, রেলস্টেশন, খালধারগুলো দেখলেই বোঝা যায়, কী উন্নত জীবন এরা যাপন করছে ! এই অবস্থায় সামান্য জমিকে কেন্দ্র করে অনেক কষ্টে দু'বেলা পেটের ভাত জোটানোর মতো আজও যাদের যতটুকু সংস্থান আছে, তাও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ফলে ওদের পরিকল্পনা মতোই চাষীর ছেলে চাষী না থেকে পথের ভিখারি হচ্ছে। এই সিপিএম নেতারা বলছেন, শিল্প উৎপাদনে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিডিপি) বাড়ে, অর্থাৎ সম্পদ বেশি বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগও প্রসারিত হয়। একসময় জাতীয় মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে কর্মসংস্থানের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। উৎপাদন বাড়লে কর্মসংস্থানও খানিকটা বাড়ত। কিন্তু এখন উৎপাদন বাড়লেও কর্মসংস্থান বাড়ছে তো না-ই, বরং কর্মসংস্থান কমছে।

শিল্পায়নের জিগির নতুন নয়

১৯৯১ সালে মনমোহন সিং-এর অর্থমন্ত্রীত্বে কেন্দ্রীয় সরকার যখন উদার শিল্পনীতি ঘোষণা করে তখন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি তাকে আবাহন করে বলেছিল, নতুন নীতির দ্বারা শিল্পস্থাপনের জন্য লাইসেন্স-পারমিট প্রথা উঠে যাওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের উপকার হবে — এতকাল কেন্দ্রের বঞ্চনার ফলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প হতে পারেনি, এবার শিল্পবিকাশে আর কোনও বাধা রইল না। ১৯৯৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সিপিএম সরকারও নয়া শিল্পনীতি ঘোষণা করে এরাজ্যে দেশি-বিদেশি বেসরকারি পুঁজিকে আহ্বান জানায়। শিল্পস্থাপনের প্রস্তাব যাতে দ্রুত সরকারি ছাড়পত্র পায়, তার জন্য রাজ্যে 'এক জানালা নীতি' নেওয়া হয়, সোমনাথ চ্যাটার্জীকে চেয়ারম্যান করে পৃথক সংস্থা হিসাবে 'পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগম' তৈরি করা হয়। সবকিছুর মধ্য দিয়ে একটা সাজো সাজো রব তুলে প্রচার করা হয় — 'রাজ্যে এবার শিল্পে জোয়ার আসছে'। মৌ (Memorandum of understanding) স্বাক্ষরের ধুম পড়ে যায়। 'শিল্প আনতে' মন্ত্রীরা বিদেশভ্রমণ বাড়িয়ে দেন। প্রায় প্রতিদিন নতুন নতুন মৌ স্বাক্ষরের ছবি ও হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের সংবাদ প্রকাশ হতে থাকে। জেলায় জেলায় 'শিল্পস্থাপনে'র জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কিন্তু কোথায় শিল্পের জোয়ার ? কিছুই হল না। দু'দিন আগে যারা ঘন ঘন বিদেশ সফর ও মৌ স্বাক্ষর নিয়ে হাততালি দিয়েছিল, তারাই পরে রঙ্গ-তামাশা শুরু করে দেয়। আসলে শিল্পায়নের এই জিগির যে একটি প্রতারণা, আমরা তখনও তা বলেছিলাম। এ বিষয়ে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে একটি পুস্তিকাও সেসময় প্রকাশ করা হয়েছিল। যাই হোক, 'শিল্পায়ন' যখন ঘটল না, তখন বলির পাঁঠা খোঁজা শুরু হয়ে যায়। মালিকশ্রেণী এ ব্যাপারে এগিয়ে আসে সরকারকে সহায়তা দিতে। সিপিএম সরকার ও মালিকশ্রেণী এবং তাদের প্রচারযন্ত্র সমস্বরে আওয়াজ তোলে — 'জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের ভয়েই দেশি-বিদেশি শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গে আসছে না'। একটির পর একটি বণিকসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শ্রমিকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে থাকেন, 'জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না'। আরও বলেন, 'শ্রমিক

আন্দোলনের জন্য রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে, তাকে পুনরুদ্ধার করতে হবে, অতএব শ্রমিক আন্দোলন চলবে না'।

শ্রমিকদের প্রতি 'মার্কসবাদী'(!) মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘন ঘন হুমকিতে মালিকশ্রেণী প্রবল হাততালি দিয়েছে, সংবাদমাধ্যম মুখ্যমন্ত্রীর 'বাস্তববাদী' 'শিল্পবান্ধব' ভূমিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছে। অথচ, প্রকৃত ঘটনা হল, জঙ্গি আন্দোলন তো দূরের কথা, গত কয়েক দশক ধরে এরাজ্যে তেমন কোনও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনই নেই। মালিকরা পি-এফ, গ্র্যাচুইটির পাওনা টাকা শ্রমিকদের দিচ্ছে না, মালিকরা যেমন খুশি মজুরি দিচ্ছে, যখন খুশি ছাঁটাই করছে, যত ঘন্টা খুশি শ্রমিকদের খাটিয়ে নিচ্ছে, তবু জোরদার আন্দোলন নেই। চা-বাগানের শ্রমিক অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যা করছে। বন্ধ কারখানার জমিতে মালিক প্রোমোটারির ব্যবসা করছে — শ্রমিক চোখের সামনে দেখেও তা প্রতিরোধ করতে পারছে না, বরং আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। তা সত্ত্বেও কোনও আন্দোলনই হচ্ছে না। কথায় কথায় আজকাল '৬৭ সালের ঘেরাও ও শ্রমিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্র বলে থাকে, '৬৭ সাল থেকেই নাকি আন্দোলনের ভয়ে এরাজ্য থেকে পুঁজিপতিরা পালিয়েছে (capital flight)। একই কথা যখন '৬৭-র ও '৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের বড় শরিক সিপিএম নেতারাও বলেন, তখন কথাটা যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে যায়। অথচ, আজও পর্যন্ত কেউই একটিও তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখাতে পারেনি যে, ঘেরাও বা ঐসময়ের শ্রমিক আন্দোলনের জন্য কত পুঁজি বা ক'টা শিল্পসংস্থা অন্যত্র চলে গেছে। কারণ, বাস্তবে এমন ঘটনা নেই। কিন্তু মালিকশ্রেণী, সংবাদপত্র ও সিপিএম সরকার ক্রমাগত এই মিথ্যা প্রচার করে যাওয়ার ফলে জনগণের একটা বিরাট অংশও বিভ্রান্ত হয়ে মনে করেন, শ্রমিকদের জন্য, ইউনিয়ন করার জন্য, আন্দোলন করার জন্যই যেন এরাজ্যে শিল্প হচ্ছে না। এরই সুযোগ নিয়ে মালিকশ্রেণী এখন শ্রমিকদের টুঁটি চেপে ধরছে, যথেচ্ছ আক্রমণ চালাচ্ছে। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনকে এভাবে পুরোপুরি স্তব্ধ করে দেওয়ার পরও শিল্পায়ন হল কই ? বরং আজ শ্রমিক আন্দোলন না থাকা সত্ত্বেও তো শিল্পের সঙ্কট ক্রমেই বাড়ছে। তাহলে শিল্পের সঙ্কটের কারণ শ্রমিক আন্দোলন নয়। আসলে শিল্পের সঙ্কট বাড়ছে, পুঁজিবাদসৃষ্ট বাজার সঙ্কটের জন্য। লুটেরা মালিকদের অতি মুনাফার লালসার জন্যই অনিবার্যভাবে শিল্পসঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে।

সিপিএম অতঃপর চীন মডেলের জয়গান শুরু করেছে। মহান মাওয়ের সমাজতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দেঙ শিয়াও পিঙ-এর নেতৃত্বে পুঁজিবাদী পথের পথিকরা চীনে পুঁজিবাদ কায়েম করেছে, একথা সকলেই জানেন। সমাজতন্ত্রের ভেকধারী এই নয়া পুঁজিবাদীরা চীনের শ্রমিক-চাষীর সস্তা শ্রম লুট করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থে চীনের মাটিতে বিশেষ লোভনীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে, যার অন্য নাম হল এসইজেড। সিপিএম নেতারা বলছেন, ওটাই উন্নয়নের পথ, শিল্পায়নের রাস্তা। এবার বাহবা আসতে শুরু করল মার্কিন মুলুক থেকেই। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সিপিএমের সমর্থনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ফলে সিপিএম যদি খোলাখুলি এদেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অবাধ প্রবেশের পক্ষে ওকালতি করে, তবে মনমোহন সিং সরকারের বিরাট সুবিধা, বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী

পুঁজির পক্ষেও ঢোকা সহজ। অতএব, মনমোহন সিং কলকাতার বণিকসভার সম্মেলনে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে ভারতের 'শ্রেষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী' বলে বাহবা দিয়ে গেলেন। মার্কিন মুলুক থেকে বাণিজ্য কর্তারা এসে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে করমর্দন করে বললেন, একজন বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রীর এমন বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই প্রশংসনীয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা ডি এফ আই ডি, এরাজ্যে বেসরকারীকরণ ফর্মুলা কার্যকর করার জন্য টাকার থলি নিয়ে এগিয়ে এল। দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেস, বিজেপি বা অন্য যেকোন বুর্জোয়া দলের চেয়ে সিপিএম যে বেশি দক্ষ ও যোগ্য, তার প্রমাণ দিতে এরাজ্যের সিপিএম সরকার, কেন্দ্র এসইজেড আইন করার আগেই ২০০৩ সালে বিধানসভায় রাজ্যের এসইজেড আইন পাশ করিয়ে নিল।

সিপিএম নেতারা চীনে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠাকারী দেং শিয়াও পিং-এর ভাষায় বলতে শুরু করলেন, 'পুঁজির রঙ নেই'। বললেন, 'বিশ্বায়নের সুযোগ নিতে হবে'। আরও বললেন, সিপিএম 'সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরুদ্ধে নয়, সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির বিরোধী' — যেন সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিটা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থবহির্ভূত। এভাবে সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতিকে আলাদা করে দেখানোর ক্ষেত্রে সিপিএমের তাত্ত্বিক নেতারা সংশোধনবাদের ভাণ্ডারে নবতম সংযোজন ঘটাবার কৃতিত্ব অবশ্যই দাবি করতে পারবেন। এইসব বলে তারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতাকে দু'একটা মিছিল-মিটিং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেললেন। এমনকী ইরাকে বর্বর মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে 'কোকাকোলা' ও 'পেপসি'র মতো দুটি ঠাণ্ডা পানীয় বয়কটের ডাক দেওয়ার জন্য এস ইউ সি আই-এর প্রস্তাব সিপিএম নেতারা প্রত্যাখ্যান করলেন, পাছে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি চটে যায়।

বর্তমান যুগে শিল্পায়ন অসম্ভব। কেন ?

সিপিএম নেতারা তত্ত্ব করে বলছেন, নয়া উদারনীতির ফলে লাইসেন্স-পারমিট ব্যবস্থা উঠে যাওয়ায় এখন ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীগুলির বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা এখন ইচ্ছামতো বিনিয়োগের স্থান নির্ধারণ করতে পারে। অতএব তাদের দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করানোর সুযোগ খুলে গেছে। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি সম্পর্কে বলছেন, আমেরিকা-ইউরোপের একচেটে পুঁজিপতিরা তাদের উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করার ক্ষেত্র খুঁজছে, বিশ্বায়নের ফলে তাদেরও ভারতের অর্থনীতিতে প্রবেশের রাস্তা প্রশস্ত হয়েছে। এর সুযোগ নিতে হবে। এই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে পশ্চিমবঙ্গে জায়গা দিলে শিল্পায়ন হবে। অতএব, শুরু হয়ে গেল দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজির ভজনা। এসব নিয়ে সিপিএমের সৎ কর্মীদের মধ্য থেকে প্রশ্ন উঠল। নেতারা বললেন, 'ওরা মুনাফা করার জন্যই আসছে, একথা ঠিক। তবে শিল্প গড়লে রাজ্যের কিছু বেকারের চাকরি হবে, বেকার সমস্যার লাঘব হবে। অতএব বেকারদের স্বার্থেই এটা করতে হবে'। এই কথা বলে সিপিএম এখন পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের জোয়ার আনা নিয়ে প্রচার এমন শুরু করেছে, যেন শিল্পের পক্ষে একটা অভূতপূর্ব নতুন অনুকূল পরিস্থিতি রাজ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে ; যেন এতদিন পর বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে !

এ হচ্ছে জনগণকে ঠকাবার ধূর্ত কৌশল। সকলেরই স্মরণে আছে, ২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে সামনে রেখে সিপিএম প্রচার তুলেছিল, এবার 'উন্নততর বামফ্রন্ট' হবে। কোথায় এবং কেন উন্নততর, পূর্বেকার বামফ্রন্টের সাথে কোথায় পার্থক্য — এসব ব্যাখ্যার ধার দিয়ে যায়নি তারা। দেওয়াল শুধু ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে 'উন্নততর বামফ্রন্টের পক্ষে রায় দিন' লেখায়। অবশ্য উন্নততর বটেই ! কারণ, অতীতে সিপিএম যতটুকু ছিটেফোঁটা বামপন্থার চর্চা করত, অর্থাৎ তাদের নিজেদের ভাষায় যে 'গোঁড়ামি'র চর্চা করত, তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে দেশি-বিদেশি পুঁজির হুকুম তামিল করার পথে তারা অনেক উন্নতি করেছে।

৩০ বছর একটানা শাসন চালাচ্ছে সিপিএম। শিক্ষায় ৩৫টা রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ নেমেছে ৩২তম স্থানে। রাজ্যের সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ধ্বংসস্তূপে পরিণত বললেই হয়। এরাজ্যে মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের পি-এফ, গ্র্যাচুইটির টাকা মেরে দিয়েও বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, ইচ্ছামতো কারখানা লকআউট-ক্লোজার করে দেয়, চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইচ্ছামতো কম মজুরিতে শ্রমিকদের খাটায়, বন্ধ কারখানার জমিতে প্রোমোটারি ব্যবসা চালায়। ৩০ বছরের সিপিএম শাসনে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে নারীপাচারে এক নম্বর রাজ্যে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নের এই ইতিহাসকেই পুঁজি করে বুদ্ধদেববাবুরা বলছেন, এবার ওঁরা শিল্পের বন্যা বইয়ে দেবেন।

সিপিএম নেতারা বলছেন, সমাজতন্ত্র এখন বহুদূর, অতএব পুঁজিবাদী পথেই চলতে হবে, তাঁরা এবার পুঁজিবাদী পথেই উন্নয়ন ঘটাবেন। আমরা আগেই বলেছি, বাইরে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে গরম গরম বুলি তারা যাই দিক, শুধু পুঁজিবাদী পথই নয়, নব্বই-এর দশক থেকে সিপিএম পুঁজিবাদের নয়া উদারনৈতিক মডেল, অর্থাৎ কোনরকম নিয়ন্ত্রণহীন পুঁজিবাদের পক্ষেই দাঁড়িয়েছে। বর্তমান বিশ্ব পুঁজিবাদের তৃতীয় তীব্র বাজার সঙ্কটের যুগে যেখানে পশ্চিমের উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিই চূড়ান্ত সঙ্কটে ধুঁকছে, সেখানে পুঁজিবাদী পথে কি আজ শিল্পায়ন বা শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব ? যদি তাই হত, তাহলে প্রথমত, ভারতবর্ষের অর্থনীতি পুঁজিবাদী নিয়মেই চলে ; দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রে তো বটেই, বেশিরভাগ রাজ্যে নানা পুঁজিবাদী দলই সরকার চালিয়ে আসছে। এরা সকলেই পুঁজিবাদী মডেলেরই পথিক। তবুও কেন ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্পে এত সঙ্কট ? কেন শিল্পের বিকাশ ঘটল না ?

সিপিএম নেতারা, এমনকী মহান মার্কসকে উল্লেখ করে, কর্মীদের একথাও বোঝাচ্ছেন যে, পুঁজিবাদী পথে ব্যাপক শিল্পায়ন হওয়ার পরই একমাত্র সমাজতন্ত্রে যাওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর এপ্রিল মাসেই মহান লেনিন যখন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান দেন, তখন প্লেখানভ ও অন্যান্য মার্কসবাদী পণ্ডিত মার্কসের দোহাই দিয়ে লেনিনের বিরুদ্ধতা করে বলেছিলেন, তা হতে পারেনা। পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটবার পরই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। লেনিন তখন বলেছিলেন, মার্কসের যুগে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ পূর্ববর্তী যুগে এটাই সত্য ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদের ক্ষয়িষ্ণু স্তর, এই স্তরে বুর্জোয়াশ্রেণীর দ্বারা

আগের মতো শিল্পায়ন আর সম্ভব নয়, এই দায়িত্ব শ্রমিকশ্রেণীকে পালন করতে হবে। লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী অত্যন্ত পশ্চাদপদ একটি দেশকে কীভাবে শিল্পে-কৃষিতে-জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অগ্রগতির উচ্চশিখরে নিয়ে গিয়েছিল, সেটা এক বিস্ময়কর ইতিহাস। প্লেখানভ মস্ত বড় পণ্ডিত হয়েও মার্কসবাদকে সৃজনশীলভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি, এটা ট্র্যাজেডি। আর ৯০ বছর পর সিপিএম আজ যখন দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থ দেখার জন্য মার্কসের নাম করে ঐ পুরনো ভ্রান্ত তত্ত্ব আওড়ায়, তখন সেটা নিছক ভাঁড়ামি।

একচেটিয়া পুঁজি আজ আর উৎপাদনমুখী নয়

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, যেহেতু দেশিয় পুঁজি আমাদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, প্রচুর বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ আমাদের প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ভারতবর্ষের সামনে সেই সুযোগ খুলে দিয়েছে। অর্থাৎ, ভারতবর্ষের শিল্পসঙ্কটের মূল কারণ হিসাবে এরা পুঁজির অভাবকেই দেখাচ্ছে। বিশ্বায়নের সুযোগ নেওয়া বলতে সিপিএমেরও এটাই বক্তব্য।

এটা নতুন কথা নয়। স্বাধীনতার পরপরই ভারতবর্ষের জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের সেবক কংগ্রেস নেতারা বলে এসেছে, পুঁজির অভাবের জন্যই ভারতবর্ষের শিল্পসঙ্কট। এদের এই মিথ্যাচারের মুখোস খুলে দিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন, ''আমাদের দেশে শিল্পোন্নয়নের পথে মূল বাধা কী ? একদল পণ্ডিত বলবেন ... মূল বাধা হচ্ছে পুঁজির অভাব, পুঁজির স্বল্পতা। পুঁজি সংগ্রহের জন্য তাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘোরা হচ্ছে। কিন্তু আমি যদি প্রশ্ন করি, যতটুকু পুঁজি ভারতবর্ষের মাটিতেই গড়ে উঠছে প্রতিদিন, যতটুকু পুঁজি অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই ধীরে ধীরে এদেশে সঞ্চিত হচ্ছে, তাও অলস হয়ে থাকছে কেন ? তা ব্যুরোক্রেটিক হয়ে পড়ছে কেন ? শিল্পোন্নয়নে তা কাজে লাগানো যাচ্ছেনা কেন ? আমি যদি প্রশ্ন করি যে, এদেশে বর্তমান পুঁজির শক্তির ভিত্তিতে নানা শিল্প-কলকারখানাগুলিতে যতটুকু উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে তার পরিপূর্ণ ব্যবহার, অর্থাৎ তাকে সম্পূর্ণ নিয়োগ করতে পারা যাচ্ছেনা কেন উৎপাদনে ? কোন কলে-কারখানায় ধর্মঘট হলেই 'উৎপাদনের এতগুলো দিন নষ্ট হয়ে গেল' বলে সরকার এবং মালিকশ্রেণী চিৎকার শুরু করে দেয়। কিন্তু যখন ধর্মঘট থাকে না, যখন শিল্পে শান্তিপূর্ণ অবস্থা থাকে, তখনও সবসময় যে উৎপাদিকা শক্তি দুর্গাপুরে, রাউরকেলায় বা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোকে কেন্দ্র করে রয়েছে, তার সম্পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে কি ? তাকে পুরোপুরি তারা কাজে লাগাতে পারছে কি?* তখনও সবসময় সে পুরোপুরি উৎপাদন দিতে পারে কি ? যদি না পারে, তাহলে ধর্মঘট তো তার জন্য দায়ী নয়। বা পুঁজির অভাব তো তার জন্য দায়ী নয়। তাহলে ... কী সেই বাধা

* একেবার হাল আমলের তথ্যও তাই বলছে ঃ ''জামসেদপুরের টাটার কারখানায় বর্তমানে উৎপাদন বছরে পাঁচ মিলিয়ন (৫০ লক্ষ) টনের কম, কেন্দ্রটির সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা দশ মিলিয়ন (১ কোটি) টন।'' (অমিতাভ গুপ্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮-২-০৭)

যার জন্য যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি দেশের মধ্যে রয়েছে তাও সবসময় পুরোপুরি ব্যবহার করা যাচ্ছে না ? আসলে ঐ বাধার মূল কারণ হচ্ছে ভারতের পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক''। (ফ্যাসিবাদ ও বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নৈতিকতার সঙ্কট, ১৯৭৩)।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সর্বহারাশ্রেণীর মহান শিক্ষক লেনিন দেখিয়েছিলেন, মার্কসের সময়ের অবাধ প্রতিযোগিতার স্তর পেরিয়ে পুঁজিবাদ এখন একচেটিয়া পুঁজির স্তরে পৌঁছেছে। এই একচেটিয়া পুঁজিবাদই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ। বিশ্বের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে তীব্র শোষণ ও অতি-মুনাফার দরুণ সেসব দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত পুঁজি জমা হয়েছে, তা তারা উৎপাদনমুখী শিল্পে বিনিয়োগ করছে না। একদিকে এই পুঁজি বিশ্বের পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে সস্তাশ্রম ও কাঁচামাল লুঠ করার জন্য রপ্তানি হচ্ছে, অন্যদিকে সুদের ব্যবসায়, ঋণপত্র কেনাবেচায়, ফাটকা কারবারে এই উদ্বৃত্ত পুঁজি ছুটছে। সেসময় একদল পেটিবুর্জোয়া তত্ত্ববিদ বললেন, এই পুঁজি যদি কৃষির উন্নতির জন্য, জনগণের জীবনমানের উন্নতির জন্য বিনিয়োগ করা হয়, তাহলে তো এই দেশগুলিতে উদ্বৃত্ত পুঁজির সমস্যা থাকে না। এদের জবাব দিয়েই লেনিন দেখিয়েছিলেন, ''কৃষিক্ষেত্র যা আজও সর্বত্র শিল্পের থেকে ভয়ঙ্কর ভাবে পিছিয়ে আছে, পুঁজিবাদ যদি তার উন্নতি করতে পারত ; যে জনগণ বিস্ময়কর প্রযুক্তিগত অগ্রগতি সত্ত্বেও আজ সর্বত্র অর্ধাহারী ও দারিদ্রপীড়িত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, পুঁজিবাদ যদি সেই জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারত, তাহলে পুঁজিবাদ আর পুঁজিবাদ থাকত না। কারণ, অর্থনীতির অসম বিকাশ এবং জনগণের প্রায় অনাহারী অবস্থাই হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক ও অবশ্যম্ভাবী বৈশিষ্ট্য।'' (সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর)।

আজ থেকে নব্বই বছর আগে মহান লেনিনের এই বিশ্লেষণের সাথে ভারতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে মেলালে এখনও অদ্ভুত মিল পাওয়া যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর গত ষাট বছরে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সম্পদ বিপুল থেকে বিপুলতর হয়েছে। হিসাবে দেখা যায়, ৫১টি বৃহৎ প্রাইভেট কোম্পানির মোট সম্পদ ১৯৬০-৬১ সালে ছিল ১০০০ কোটি টাকা, ১৯৮৩-৮৪ সালে তা বেড়ে হয় ১১,৬৮৩ কোটি টাকা। টাটা গোষ্ঠীর সম্পদ ১৯৭২ সালে ছিল ৬৪২ কোটি টাকা, ১৯৮৯-৯০ সালে মাত্র ১৭-১৮ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৮৫৩১ কোটি টাকা। টাটা-আম্বানি-প্রেমজি ও আরও কয়েকজন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের নাম এখন বিশ্বের শীর্ষ সম্পদশালী পুঁজিপতিদের তালিকায় ঢুকেছে। অন্যদিকে ভারতের কৃষিক্ষেত্রও এখন গভীর সঙ্কটে, শিল্পের বিকাশ রুদ্ধ, জনসংখ্যার বেশিরভাগটাই দারিদ্র্যের গভীর অন্ধকারে রয়েছে। অশিক্ষা, চিকিৎসার অভাব, রোগে মৃত্যু, অপুষ্টি ও অনাহারে মৃত্যু দেশে বাড়ছে। কৃষকদের আত্মহত্যা এখন একটা রোজকার খবরে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই গভীর সমস্যার কোনও একটিকেও সমাধান করতে, বা অন্তত লাঘব করতে কি টাটা-আম্বানি-বিড়লারা তাদের বিপুল পুঁজি নিয়ে এগিয়ে আসছে ? পরিবর্তে আমরা দেখছি, বিপুল পুঁজির ভাণ্ডার নিয়ে এরা বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে এবং নানা দেশে নানা কোম্পানি কিনে নিয়ে নিজেদের সম্পদ বাড়িয়েই চলেছে।

ভারতে শিল্পসংকটের জন্য পুঁজির স্বল্পতা দায়ী নয়

অন্যদিকে ভারতবর্ষের বড় বড় কোম্পানিগুলোর গত কয়েক দশকের হিসাবের খাতায় দৃষ্টি দিলেই দেখা যাবে, সেখানে 'আদার ইনকাম' বা 'অন্য উপায়ে আয়' বলে একটা খাত তৈরি করা হয়েছে। এমনকী দেখা যাচ্ছে, একটা কোম্পানির মুনাফার মধ্যে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি থেকে পাওয়া আয়ের চেয়েও 'আদার ইনকাম'-এর পরিমাণ বেশি। এই 'আদার ইনকাম'-ই হচ্ছে শেয়ার বাজারের ফাটকা সহ নানা রকম সুদ থেকে আয়। এ সম্পর্কে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা উল্লেখ করে একটি পত্রিকা জানিয়েছে, প্রায়শই সংবাদপত্রে বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির 'মুনাফা বাড়ছে' বলে যে খবর প্রকাশ হয়, তার থেকে একথা মনে করা ভুল যে, দেশে শিল্পের বাজারের প্রসার ঘটছে। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকাও (১১-৮-০৩) স্বীকার করেছে, 'পণ্য বিক্রিজাত আয়ের চেয়েও মুনাফা বেশি বাড়ছে ! এর রহস্য কী ?' এটা কেন ঘটছে — এই প্রশ্ন তুলে তারাই জানিয়েছে যে, গত বেশ কয়েক বছর ধরে বৃহৎ কোম্পানিগুলো উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত আছে, পরিবর্তে তারা টাকা ঢালছে বন্ড, শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ও সরকারি ঋণপত্র কেনাবেচায়। এই ক্ষেত্রগুলিকে 'অন্য আয়' বা 'আদার ইনকাম' বলা হচ্ছে (পণ্য বিক্রির থেকে আয়ের সাথে পার্থক্য বোঝাতে)। দেখা যাচ্ছে, এই অন্য খাত থেকে আয়টাই মুনাফার একটা বড় অংশ দখল করে আছে। ১২৬৭ টি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মুনাফার উপর সমীক্ষা চালিয়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেখেছে, এদের করপূর্ব মুনাফার মধ্যে ৩৫.৫ শতাংশ হচ্ছে 'অন্যান্য আয়' থেকে পাওয়া মুনাফা। নগদ টাকা এবং সহজে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায় এমন সম্পদ মিলিয়ে ২০০১-০২ সালে ২৪টি কর্পোরেট সংস্থার সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৩৪,৬২৯ কোটি টাকা, যেটা ২০০২-০৩ সালের মার্চের শেষে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৬,৪২৪ কোটি টাকা। এই সমীক্ষাই দেখিয়ে দেয় যে, ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পরিবর্তে সুদের আয় ও নানা ফাটকা কারবারে টাকা খাটাচ্ছে। কেন এটা তারা করছে ? কারণ, শিল্পপণ্য কেনার মতো বাজার, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা দেশে খুবই কম। সদ্য প্রকাশিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (২০০৪-০৫) থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতের গ্রামীণ জনগণের ৩৩ শতাংশ জীবনধারণের জন্য দৈনিক ১২ টাকার বেশি খরচ করতে পারে না। শহরের ক্ষেত্রে এটা দৈনিক ১৯ টাকা। এই আয় দিয়ে দু'বেলা সংসারের ভাত জোটানোই যেখানে অসম্ভব, সেখানে শিল্পপণ্য কেনার চিন্তা অলীক স্বপ্ন মাত্র। এমনকী যাদের রোজগার দৈনিক ৪০/৫০ টাকা, তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ফলে, পুঁজির অভাবের জন্যই দেশে শিল্পবিকাশ হয়নি বা হচ্ছে না, এ কথা নিতান্তই মিথ্যাচার, জনগণকে ঠকিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বন্ধ্যা অবস্থাকে আড়াল করার কৌশল মাত্র।

শিল্পোন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর উদ্বৃত্ত লগ্নিপুঁজিও এখন শেয়ার, বন্ড, ঋণপত্র কেনাবেচাতেই ছুটছে, আবাসন ব্যবসায় যাচ্ছে, পাশাপাশি অর্থের ব্যবসা, অর্থাৎ সুদের

কারবারই এখন তার প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল অগ্রগতি বিশ্বের তাবড় তাবড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সকল দেশের শেয়ার বাজারে ও নানারকম ফাটকা ব্যবসায় ঢোকার ও বেরোবার রাস্তা সহজ করে দিয়েছে। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরাও পুঁজির এই ফাটকা চরিত্র অস্বীকার করতে পারছেন না। এ নিয়ে তাঁদের উদ্বেগের শেষ নেই। নিত্যনতুন দাওয়াই বাতলাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু স্থায়ী মন্দার থেকে অর্থনীতি যেমন বেরোচ্ছে না, তেমনই একচেটিয়া পুঁজিকেও আর উৎপাদনমুখী করা যাচ্ছে না। একচেটিয়া পুঁজির যুগে লগ্নিপুঁজির বন্ধ্যা চরিত্র দেখাতে গিয়ে লেনিন সেসময়ই 'সাম্রাজ্যবাদ — পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর' লেখায় বলেছিলেন, বড় বড় শহরের আশেপাশে জমির ফাটকা কারবারে লগ্নিপুঁজি বিশেষ আগ্রহী। কারণ এখানে মুনাফা বেশি। (''Speculation in land situated in the suburbs of rapidly growing big towns is a particularly profitable operation for finance capital.'')। বর্তমানেও দেখা যাচ্ছে, বিদেশের মর্গান স্ট্যানলে, মেরিল লিঞ্চের মতো অর্থলগ্নিকারী কোম্পানিগুলো ভারতে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় লগ্নি করতে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদের কাছে এখন ভারতের রিয়েল এস্টেট বাজার খুবই লোভনীয়। এজন্য যে ফান্ড তৈরি করা হয়েছে, তাতে অর্থের অঙ্ক ইতিমধ্যেই ২০০ কোটি ৭০ লক্ষ ডলারে পৌঁছেছে (মান্থলি রিভিউ পত্রিকা, সেপ্টেম্বর ২০০৬)।

ভারতবর্ষে শিল্পায়নের পথে বাধাটা কিভাবে কোথা থেকে আসছে তা জনগণের সামনে পরিষ্কার করে দিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, ''আমি আগেই বলেছি, সমস্যার আসল সমাধান করতে হলে কৃষিতে আধুনিকীকরণ করতে হবে এবং তার জন্য শিল্পের অগ্রগতির দ্বার খুলে দিতে হবে। অথচ আমাদের দেশে শিল্পের অগ্রগতির পথে বাধা কী ? প্রথমত, আমাদের দেশে পুঁজিবাদী-সম্পর্কের ভিত্তিতে উৎপাদন হয় বলে, অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন হয় বলে মজুররা যারা কলেকারখানায় কাজ করে, তারাও ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত। দ্বিতীয়ত, এর সঙ্গে রয়েছে শহরাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বেকার এবং অর্ধবেকার .....। ফলে এমনিতেই শহরাঞ্চলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে ... যারা গ্রামে বাস করে, তার শতকরা ৭৫ জন অর্ধভুক্ত অবস্থায় অমানুষের মতো দিনযাপন করে। একটা দেশে জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ ভাগ .... লোকেরই যেখানে প্রায় কেনবার ক্ষমতাই নেই ... এ'রকম দেশে বাজার, অর্থাৎ শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্য কেনবার লোক কোথায় ? আর, বাজার না থাকলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় না। কারণ, পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। তাই এরকম দেশে সাবসিডি দিলেই, লাইসেন্স-পারমিট দিলেই হু হু করে কলকারখানা গড়ে উঠতে পারে না ; এবং যে কলকারখানা চালু থাকে সেগুলোও, তাদের যতটুকু উৎপাদিকা শক্তি আছে, সবসময় তার পুরো সদ্ব্যবহার করতে পারে না। ... মনে রাখা দরকার, একেকটা সমাজ গড়ে ওঠে একেকটা উৎপাদন-সম্পর্ককে ভিত্তি করে। আবার .... কিছুদিন চলতে চলতে সেই বিশেষ উৎপাদন-সম্পর্কটি অকার্যকরী হয়ে যায়, উৎপাদনের বিকাশের পথে সেই বিশেষ উৎপাদন-সম্পর্ক বাধা হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে।

তখনই দেখা দেয় উৎপাদন-সম্পর্ককে পাল্টাবার জন্য অর্থনৈতিক-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন। সমাজের নতুন প্রয়োজনে, নতুন তাগিদে, নতুন উৎপাদন-সম্পর্কের ভিত্তিতে অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের প্রয়োজন। ... (এজন্যই) বিপ্লবের আঘাতে বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে পাল্টে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতে না পারলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক থেকে উৎপাদন ব্যবস্থাকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। ... ফলে আমরা যখন ভারতবর্ষে বিপ্লবের কথা বলি, ... তখন সেটা একটা রাজনৈতিক চালাকি নয়।'' (ঐ)

বিশ্বায়নের নীল নক্সা

বস্তুত, বাজারসঙ্কটে জর্জরিত দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে উৎপাদনমুখী শিল্পে লগ্নী হতে না পারা উদ্বৃত্ত পুঁজিকে আবাসন, রাস্তাঘাট, সেতু, শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, ফ্লাইওভার, পরিষেবা ক্ষেত্র যথা, শিক্ষা, হাসপাতাল, পরিবহন এবং ব্যাংক-বীমা ব্যবসায়, সরকারি শিল্পসংস্থা কেনায় লগ্নি করার ও মুনাফা লোটার সুযোগ করে দেওয়ার কাজটাই আজ সমস্ত দেশে পুঁজিবাদী দল ও সরকার করে যাচ্ছে। এটাকেই বিশ্বায়ন বা অবাধ বাণিজ্যের যুগ বলে প্রচার করা হচ্ছে। ভারতবর্ষে সিপিএম সহ সব রাজ্যের সরকারি দলগুলি এবং পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত তথাকথিত বিরোধী দলগুলি একই ধারা মেনে চলছে। এককথায় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি প্রমুখ দলগুলি পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ দালালি করছে।

উদ্বৃত্ত একচেটিয়া পুঁজি খাটানোর ব্যবস্থা করে দিতে বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীরা একটি সাধারণ নক্সা ঠিক করেছে ঃ

(১) বড় বড় শহরের পার্শ্ববর্তী এলাকার জমি দখল করে শহর বাড়ানো, অর্থাৎ উপনগরী তৈরি। ধনীরা শহরের সুবিধা ভোগ করবে, আবার একটু নিরালায় থাকার সুবিধাও পাবে। তাদের আরাম-আয়েস-স্ফূর্তির সবরকম ব্যবস্থা সেখানে থাকবে। চার-ছয় লেনের মসৃণ রাস্তা হবে, যাতে কোটিপতিরা অতি দ্রুত মূল শহরে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে যাতায়াত করতে পারে, বিমানবন্দরের সুবিধাও পেতে পারে। এজন্য হাজার হাজার বিঘা জমি লাগবে। চাষীদের উচ্ছেদ করেও সে জমি সরকারগুলো দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবে। এসব নিয়ে লক্ষ কোটি টাকা খাটানো দরকার হবে। উদ্বৃত্ত অলস পুঁজি বিনিয়োগ ও মুনাফা করার সুযোগ পাবে। এই ব্যবসাকে বলা হচ্ছে রিয়েল এস্টেট বিজনেস বা প্রোমোটারি।

(২) রাস্তাঘাট, সেতু, বিমানবন্দর, নৌবন্দর ইত্যাদি সরকার তৈরি করবে না। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা এখানে লগ্নি করবে ও টোল, কর আদায় করে মুনাফা ঘরে তুলবে।

(৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, পরিবহন এসব আর সরকার চালাবে না। দেশি-বিদেশি পুঁজি এখানে ঢুকবে, ব্যবসা করবে, মুনাফা লুটবে।

(৪) সার, বীজ, কীটনাশক, সেচের জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদির দাম বাড়িয়ে চাষের খরচ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। চাষীরা সরকারি ঋণ পাবে না। মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ

করতে বাধ্য হবে। এমনিতেই চাষী ফসলের দাম ঠিক করে না, ব্যবসায়ীরা কম দামে চাষীকে বাধ্য করে ফসল বেচতে। ফলে আরও বেশি বেশি করে ঋণে জড়িয়ে যাওয়া চাষী বাধ্য হবে দেশি-বিদেশি পুঁজির সাথে চুক্তিচাষ-এর ব্যবস্থায় যেতে। এরা চাষীকে টাকা যোগাবে, বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ফসল ফলাতে চাষীকে বাধ্য করবে। বাজার আজ আছে, কাল নেই। বাজার ডুবলে চাষীর মাথায় হাত। তখন সরকারগুলো চাষীকে বাঁচাবার নাম করে চাষীর জমি কেড়ে নিয়ে, অথবা কম দামে কিনে নিয়ে পুঁজিপতিদের জমি নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেবে। তাছাড়া চাষীকে বাঁচাবার নাম করে এখন আম্বানির মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরও কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবসায় ঢোকানো হচ্ছে। এর ফলে শুধু চাষী ডুববে না, কৃষিপণ্য বেচাকেনার ওপর নির্ভর করে যে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী টিকে আছে, তারাও ধ্বংস হবে। এই হচ্ছে চুক্তিচাষ ও কৃষিপণ্যের খুচরা ব্যবসায় রাঘববোয়ালদের অনুপ্রবেশের নিট ফল।

(৫) রিয়েল এস্টেট বা প্রোমোটারি ব্যবসার পাকা বন্দোবস্তের পাশাপাশি বিশাল এলাকা ধরে ১৫/২৫/৫০ হাজার বিঘার মতো জমি চাষীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে সরকারগুলো বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এস ই জেড) তৈরি করার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। সেখানে নানা শিল্প হবে বলা হচ্ছে। তাদের সব গালভরা নাম — কেমিক্যাল হাব, ফুডপার্ক, বায়োপার্ক ইত্যাদি। হয়তো একটা-দুটো কারখানা হবে। কিন্তু সেজন্য অত জমি লাগে না। বাড়তি বিপুল জমি আসলে প্রোমোটারির জন্যই হাতে রাখা হবে। এই এস ই জেড এলাকায় রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, জল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি পরিকাঠামো তৈরির কাজ করবে যে পুঁজিপতি, তাকে বলা হচ্ছে ডেভেলপার। যেমন নন্দীগ্রামে এ কাজ করতে যাচ্ছিল ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠী। এই ডেভেলপাররাই পরে সেই জায়গাগুলো বিক্রি করবে এবং কোটি কোটি টাকা লাভ করবে। এক নতুন জমিদারি ব্যবস্থার পত্তন করা হবে এস ই জেডগুলির দ্বারা। এখানে যারা শিল্প বা ব্যবসাকেন্দ্র করবে, তাদের কোনও ট্যাক্স দিতে হবে না। জল, বিদ্যুৎ, নিকাশী — সব প্রায় বিনামূল্যে। শ্রমিকদের খুশিমতো কম মাইনে, যখন তখন ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের সুযোগ থাকবে পুঁজিপতিদের। দেশের শ্রমআইনের বাইরে থাকবে এইসব এসইজেড। শ্রমিকদের মিটিং-মিছিল-সংগঠন করার, দাবিদাওয়া তোলার কোনও অধিকারই থাকবে না। এসব এলাকার আইনকানুন, প্রশাসন সবই মালিকদের হাতে থাকবে। অর্থাৎ একটি দেশের ভিতর আরেকটি স্বতন্ত্র দেশ বা রাজ্য তৈরি হবে।

(৬) অর্থের ব্যবসা (ফিনান্স), পুঁজির ব্যবসা — ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য খুলে দেওয়া হবে — যাতে এখানকার অর্থ তারা অবাধে ঋণপত্র কেনাবেচায়, আবাসন ব্যবসায়, বিভিন্ন পণ্যের ফাটকা কারবারে, শেয়ার বাজারের জুয়ায় খাটাতে পারে। অর্থের বাজারের ব্যবসায়, ফাটকা কারবারে পুঁজির খাটবার বেশি বেশি সুযোগ করে দেওয়ার জন্য নানারকম নতুন নতুন উপায়ও (instruments) সৃষ্টি করা হয়েছে।

(৭) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ করা ও সমস্ত ক্ষেত্রকেই দেশি-বিদেশি পুঁজির জন্য খুলে দেওয়া হবে, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যক্তিপুঁজিব. কাছে বেচে দেওয়া হবে।

এই হচ্ছে আজকের যুগে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিকে বাজারসঙ্কট থেকে বাঁচানোর জন্য বিশ্বায়নের নীল নক্সা, যাকে বলা হচ্ছে নয়া উদারনীতিবাদ। বিশ্বায়নের এই নীতির পথ বেয়েই কৃষিজমি দখলে নেমেছে ক্ষমতাসীন সকল দলের সরকার।

কৃষিজমি ধ্বংস খাদ্যসঙ্কট সৃষ্টি করবে

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম সহ বহু স্থানে উর্বর কৃষিজমিকে অকৃষি কাজের জন্য শিল্পপতি নামধারী প্রমোটারদের মধ্যে বিলিবন্দোবস্ত করার সরকারি উদ্যোগে অনেকেই খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন। সিপিএম সরকার অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ব'লে থাকে যে, এ রাজ্য খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তো বটেই, রাজ্যে উদ্বৃত্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়। খাদ্য নিশ্চয়তার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মাপকাঠিতে তাদের এই দাবি সবদিক থেকেই অসার এবং বাগাড়ম্বর। এমনকী পর্যাপ্ত কৃষি উৎপাদনের যে গল্প তারা বলে তাও প্রকৃতপক্ষে গোঁজামিলের হিসেব।

প্রথমত, রাজ্যে খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হ'লে তার দ্বারাই প্রমাণ হয় না উৎপাদন পর্যাপ্ত। কেননা, জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য কেনার ক্ষমতাই নেই। ক্রয়ক্ষমতার অভাবে তারা পুঁজিবাদের নিয়মেই, খাদ্যের বাজারে চাহিদা সৃষ্টির হিসাবের বাইরেই থাকে। এরা সেই অংশ যারা খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিতে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে তাদের সংখ্যা কত তার হিসাব নিলেই বোঝা যাবে যে, এই সব মানুষ যদি সঠিক পরিমাণ খাদ্য পেতেন তাহলে বর্তমানে যে উৎপাদনের পরিমাণ তা পর্যাপ্ত কি না।

গবেষকদের হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০০-০১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ১-৫ বছরের শিশুদের ৪৯.৬ শতাংশ অপুষ্টিতে আক্রান্ত এবং গ্রামে পূর্ণবয়স্ক পুরুষদের ৪০.৫ শতাংশ এবং মহিলাদের ৪৫.৯ শতাংশ কর্মশক্তির ঘাটতিতে বারোমাসই আক্রান্ত (ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ৩০-৪-২০০৫)। অর্থাৎ এই সংখ্যক গ্রামীণ মানুষ উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য পান না। উল্লেখযোগ্য যে, সিপিএমের ৩০ বছরের 'উন্নত শাসনে' এই রাজ্যের অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা শুধুমাত্র সর্বভারতীয় গড় অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা থেকে অনেক বেশি তাই নয়, প্রগতিশীলতার প্রচারের আড়ালে যা সর্বদা প্রচ্ছন্ন থাকে, তা হ'ল, এই সংখ্যা অন্য সব রাজ্য, যেখানে দক্ষিণপন্থীরা সরকার চালায়, তাদের থেকেও বেশি। তাই এ রাজ্যে শুধুমাত্র মাথাপিছু চাল উৎপাদন যা ১৯৭৭ সালে ৪১৯ গ্রাম থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬ সালে ৪৫৪ গ্রাম হয়েছে, তা দিয়ে এটুকু মাত্র বলা যায় যে, এ রাজ্যে চাল উৎপাদন গত ৩০ বছরে মাথাপিছু ৩৫ গ্রাম মাত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাথে স্মরণে রাখা ভালো যে, শুধুমাত্র চালই একমাত্র কৃষিজাত পণ্য নয়, যা আমাদের প্রয়োজন — এর সাথে গম, ডাল, ভোজ্যতেল এবং নানাবিধ সব্জিও প্রয়োজন। গম, ডাল ও ভোজ্যতেলে পশ্চিমবঙ্গ ঘাটতি রাজ্য এবং এইগুলি এ রাজ্যে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও

নেওয়া হয় যে, চাল উদ্বৃত্ত, তবু শুধুমাত্র তা দিয়েই মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা রয়েছে বলা হাস্যকর।

দ্বিতীয়ত, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যেখানে মোট জমির ৪৬.০৭ শতাংশ কৃষির অধীন, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে তার পরিমাণ ইতিমধ্যেই ৬২.৮৯ শতাংশ। আবার অকৃষি কাজে পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই ১৮.৫২ শতাংশ জমি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তার পরিমাণ মাত্র ৭.৭০ শতাংশ। এ অবস্থায় সরকার ১,৪৩,৫০০ একর জমি শিল্পস্থাপনের নামে অকৃষিকাজে ব্যবহারের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে কৃষিকাজের জন্য জমি ব্যবহারের পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে কমে গিয়ে খাদ্য উৎপাদনে ঘাটতি ঘটাবে। এর ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের আরেকটি চাহিদাও পূরণ হবে। তারা দীর্ঘদিন ধরেই চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের উদ্বৃত্ত কৃষিপণ্যে বিপুল সাবসিডি দিয়ে ভারতের বাজার গ্রাস করতে। এখন এদেশে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক ঘাটতি সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদীদের সেই সুযোগ করে দেওয়া হবে, বিদেশের খাদ্যদ্রব্যের ওপর দেশ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। এছাড়া একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তাদের বাড়তি পুঁজি দিয়ে কৃষি ও শিল্পপণ্য বিক্রির ব্যবসাও গ্রাস করতে চলেছে, যার ফলে খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা, গ্রামীণ হাটবাজার, দোকান বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। আম্বানিরা পশ্চিমবঙ্গে প্রায় প্রতি ব্লকেই এমনকী তার থেকেও নিচুস্তরে এই ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছে। এর ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, গরিব-মধ্যবিত্ত-কৃষক-খেতমজুর- ক্ষুদ্র-মাঝারি দোকানদার — সবকিছুই ধ্বংস হতে চলেছে।

সিপিএম এ পথে কেন যাচ্ছে

সিপিএম নেতৃত্ব সব জেনেবুঝেই এই পথ নিয়েছে। তারা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের দেখাতে চায়, চীনের বুর্জোয়া শাসকদের মতো পশ্চিমবঙ্গের সিপিএমও যেমন খুশি কৃষকের জমি কেড়ে নিতে পারে, এসইজেড করতে পারে, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য সমস্ত ব্যবসা খুলে দিতে পারে। এর দ্বারা তারা দেশি-বিদেশি পুঁজির আশীর্বাদে পশ্চিমবঙ্গ ,কেরল ও ত্রিপুরায় তাদের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়, অন্যান্য রাজ্যে শক্তি বাড়াতে চায় এবং কেন্দ্রের সরকারে ক্ষমতা বাড়িয়ে নিতে চায়। কারণ, বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরাই টাকার জোরে সবকিছু কন্ট্রোল করে; সরকারি গদিতে কারা বসবে সেটাও তারাই ঠিক করে।

ফলে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, সরকারের মাধ্যমে কৃষকদের উপর মূল আক্রমণটা চালাচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ। তাছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও আন্দোলনের সময় খেয়ালে রাখতে হবে। তা হচ্ছে, সিপিএম-এর মতো চূড়ান্ত ফ্যাসিস্টসুলভ একটি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দাবি আদায় করতে হলে আন্দোলনকে সংগঠিত, সংঘবদ্ধ ও দীর্ঘস্থায়ী হতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার বলেছেন, শুধু লড়াই করলে, রক্ত দিলে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকলেই হবে না। লড়াইয়ের নেতৃত্ব, রাজনীতি, রাস্তা সঠিক হওয়া দরকার। এই জরুরি প্রয়োজন থেকেই বর্তমান আন্দোলনেরও নানা দিক জনগণকে ভেবে দেখতে আমরা অনুরোধ জানাব।

দাবি আদায়ের জন্যই আন্দোলন, ভোটের জন্য নয়

সিপিএম দলের মধ্যে যাঁরা সৎ, যাঁরা পুঁজিপতিদের পায়ে নিজেদের বিবেক বিক্রি করতে পারেননি, তাঁরা আমাদের বলছেন, আমরা যেন লড়াই চালিয়ে যাই। তৃণমূল কংগ্রেসের নীচুতলার কর্মীরাও বলছেন, এস ইউ সি আই থাকলে লড়াই ঠিকমতো চলবে। এমন কথাও কেউ কেউ বলছেন, এস ইউ সি আই এবং তৃণমূল কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করুক। আমাদের বক্তব্য, কিসের ভিত্তিতে এই ঐক্য হবে? জনগণ জানেন, এস ইউ সি আই ভোটের দিকে তাকিয়ে আন্দোলন করে না ; মন্ত্রীত্বের লোভ, এম পি-এম এল এ বাড়ানোর মোহ নিয়ে চলে না। ২০০১ সালের বিধানসভা ভোটের আগে সিপিএম নেতৃত্ব এস ইউ সি আই-এর সঙ্গে ভোটে ঐক্য চেয়েছিল। আমরা বলেছিলাম, তাঁদেরকে আমরা কোনদিনই কমিউনিস্ট পার্টি বলে বিবেচনা করিনি। কিন্তু অতীতে যতটুকু বামপন্থার চর্চা তাঁরা করতেন, এখন তাও পরিত্যাগ করে সরকারে বসে যা করছেন, তাতে কংগ্রেস-বিজেপি'র সরকারের সাথে তাদের কোনও পার্থক্য থাকছে না। ফলে ঐক্যের কোনও জায়গা নেই। একই কথা তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটি দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া পার্টির ক্ষেত্রেও সত্য। কিছুকাল আগেও তারা কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপি'র শরিক ছিল। ঐ সরকারের সময়েই এস ই জেড গড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সিঙ্গুরে জোর করে জমি দখলের ইস্যু সামনে আসার পর তৃণমূল নেত্রী কলকাতায় পুঁজিপতিদের একটি সভা করে বলেছিলেন, তাঁরা যেন তৃণমূল কংগ্রেসকে ভুল না বোঝেন, তৃণমূল কংগ্রেস পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে নয়। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, তৃণমূল কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার দল নয়। কিন্তু এস ইউ সি আই হচ্ছে, পুঁজিবাদবিরোধী-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যথার্থ একটি মার্কসবাদী বিপ্লবী দল। তৃণমূল কংগ্রেসও আন্দোলনের কথা বলে একথা ঠিক, তবে তারা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করে চলে। উপরের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, বর্তমান চূড়ান্ত সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদের যুগে পুঁজিবাদী রাস্তায় শিল্পায়ন অসম্ভব, সিপিএম-এর শিল্পায়ন-প্রচারটাই ধাপ্পা। তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে, শিল্পায়ন সম্ভব, তবে সিপিএম সেটা করতে পারবে না ; তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে বসলে তারা পারবে। স্পেশাল ইকনমিক জোন পরিকল্পনাকেও তারা সমর্থন করে, যেমন সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি করে।

অন্যদিকে আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দাবি আদায়ের আন্দোলন গড়ে তোলা ও পরিচালনার সাথে সাথে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা গড়ে তোলা, এবং জনগণের নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেওয়া। আমরা জানি, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ যতদিন থাকবে, কৃষিজমির উপর, কৃষক-বর্গাদার-খেতমজুরদের ওপর, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের উপর বারবার আক্রমণ আসবে। তাই এই সমস্ত সমস্যার মূল ভিত্তি পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতেই হবে। এর জন্যই দরকার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ, যে আদর্শকে ভিত্তি করেই দেশে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব সফল করা সম্ভব। তৃণমূল কংগ্রেস এই আদর্শে বিশ্বাসী

নয়, তারা পুঁজিবাদের পথে চলে। এখানেই আমাদের সাথে তাদের মৌলিক পার্থক্য।

সিপিএম সরকারের বিরুদ্ধে তৃণমূলের আন্দোলন করার রীতিনীতি-প্রক্রিয়া অনুধাবন করলে, '৫০-'৬০-এর দশকে সিপিআই-সিপিএমের ভূমিকার সাথে অনেকটা মিল পাওয়া যাবে। সেসময় মার্কসবাদের কথা বলে সিপিআই-সিপিএম যেভাবে কংগ্রেসবিরোধী গণবিক্ষোভ জাগিয়ে ভোটে কাজে লাগাবার চেষ্টা করত, এখন তৃণমূল নেতৃত্বও সেই চেষ্টা চালাচ্ছে। এদের এই ভূমিকার জন্যই সিঙ্গুরে আন্দোলন দুঃখজনক পরিণতির দিকে গেল। অথচ আমরা জানি, সিঙ্গুরের জনগণও লড়াই করতে প্রস্তুত ছিল। নন্দীগ্রামের মানুষ যেভাবে প্রতিরোধ করেছে সিঙ্গুরের কৃষকরাও সেটা পারত, কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বের জন্য সেটা সম্ভব হল না। সিঙ্গুরে এস ইউ সি আই-এর সংগঠন থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেসই সেখানে প্রধান শক্তি। বিধানসভার আসন থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত তৃণমূলেরই। তবুও তারা জনগণকে সেভাবে লড়তে দিল না। এজন্য আমাদের দলের সাথে তাদের প্রবল দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে।

সিঙ্গুরের এইসব ঘটনাবলী রাজ্যের জনগণের জানা প্রয়োজন। সিঙ্গুরে জমি দখল করার কথা সরকার ঘোষণা করার পর প্রথম এস ইউ সি আই কর্মীরাই সেখানে আন্দোলন শুরু করেছিল, যেটা রাজ্যের অনেক মানুষই হয়তো জানেন না। এস ইউ সি আই আন্দোলনে নেমেছে দেখেই তৃণমূল কংগ্রেস তৎপর হয়ে ওঠে। এরপর ওখানে আন্দোলন পরিচালনার মঞ্চ হিসাবে দলমতনির্বিশেষে স্থানীয় লোকদের নিয়ে 'কৃষিজমি রক্ষা কমিটি' গড়ে তোলা হয়। সেই কমিটির যুগ্ম কনভেনরের একজন হন এস ইউ সি আই-এর, অপরজন তৃণমূলের। প্রতিটি গণআন্দোলনেই এস ইউ সি আই যেমন জনগণের নিজস্ব হাতিয়ার হিসাবে গণকমিটি গড়ে তোলার উপর জোর দেয়, সিঙ্গুরেও তেমনি এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে ছাত্র-যুব-মহিলাদের পৃথক পৃথক কমিটি পাড়ায় পাড়ায় গড়ে তোলা হয়েছিল। এস ইউ সি আই কর্মীরা উদ্যোগ নিয়ে আন্দোলনের ভলান্টিয়ার বাহিনীও গড়ে তুলেছিল, যারা আক্রমণ হলে প্রতিরোধ করবে।

এস ইউ সি আই চেয়েছিল, আন্দোলনকে প্রতিরোধের স্তরে নিয়ে গিয়ে প্রয়োজনে দীর্ঘস্থায়ী সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, যেমন নন্দীগ্রামে পরে হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব এরকম আন্দোলন চায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল, যেভাবে হোক মিডিয়ার পাবলিসিটি পাওয়া এবং তারা যে খুব লড়াই করছে সেটা দেখানো। এসবের দ্বারা জনগণের মধ্যে প্রভাব বাড়িয়ে নিতে পারলেই আগামী ভোটে তা ফল দেবে, এই ছিল তাদের হিসাব। শহীদ যুবক রাজকুমার ভুল ও কিশোরী তাপসী মালিকের মর্মান্তিক হত্যাকে কেন্দ্র করে রাজ্যব্যাপী জনগণের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ গড়ে ওঠা সত্ত্বেও বড়ো আন্দোলন করা সম্ভব হল না তৃণমূল নেতৃত্বের জন্যই; যদিও এস ইউ সি আই সাধ্যমতো তার চেষ্টা করেছে। ১ ও ২ ডিসেম্বর যখন সরকার পুলিশ দিয়ে সিঙ্গুরে জমি দখল করতে নেমেছিল, তার বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সংগ্রাম হয়েছিল সেখানে জনগণের সঙ্গে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল এস ইউ সি আই কর্মীরাই। তৃণমূল নেতারা চেয়েছিলেন শুধু আইনঅমান্য করে গ্রেপ্তার হয়ে দায়িত্ব শেষ করে ফেলতে।

২ ডিসেম্বর সিঙ্গুরে বর্বর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই ৫ ডিসেম্বর ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট ও হরতাল ডাকার পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ডি এম এবং এস পি অফিসে বিক্ষোভ দেখিয়ে, অবরোধ করে আন্দোলনকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এজন্য পুলিশি অত্যাচার নেমে এসেছিল এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর, আহত হয়েছেন বহু কর্মী। সে সময় হঠাৎ তৃণমূল নেত্রী কলকাতায় অনশন শুরু করেন। যখন প্রয়োজন ছিল সিঙ্গুরের মাটিতে থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনকে জোরদার করার সাথে সাথে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়া এবং তার জমিও যখন তৈরী, সেসময় ব্যাপক জনগণকে কার্যত নিষ্ক্রিয় রেখে কলকাতায় একজন ব্যক্তির অনশন এতবড় একটা সম্ভাবনাকেই বিনষ্ট করে দেয়। আমরা জানি, অনশন করার ফলে তৃণমূল নেত্রীকে শারীরিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সংবাদমাধ্যমে তার প্রচারও পেয়েছে। কিন্তু তার দ্বারা আন্দোলন এগোয়নি, বরং দুর্বল হয়েছে। অনশনমঞ্চ ঘিরে নেতা-মন্ত্রী-রাজ্যপাল-রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি ও তৎপরতা জনগণের দৃষ্টিকে কলকাতার অনশন মঞ্চের দিকে টেনে নিয়েছে, সিঙ্গুরের আন্দোলন পিছনে চলে গেছে। চারিদিকে এমন প্রচার তোলা হয়েছে যেন অনশনই সবকিছু নির্ধারণ করে দেবে, অন্য আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। শেষপর্যন্ত সরকার আলোচনা করতে রাজি — শুধুমাত্র এই শর্তে তৃণমূল নেত্রী অনশন প্রত্যাহার করেছেন, সেটা মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন। সিঙ্গুরে টাটার জন্য জমি নেওয়া হবেই, তবে আলোচনা করতে তিনি প্রস্তুত— একথা মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই বলেছেন। ফলে নতুন কিছু তৃণমূল পায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর এই ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করার পর এখন তৃণমূল নেত্রী বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর কথায় তিনি বিশ্বাস করলেন কেন?

নন্দীগ্রাম ভুল করেনি

নন্দীগ্রামের মানুষ কিন্তু নেতা-মন্ত্রীদের ফাঁকা কথায় ভুল করেনি। নন্দীগ্রামের আন্দোলনে তৃণমূল দলের প্রাধান্য ছিল না। এস ইউ সি আই-ই ওখানে প্রথম আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সিপিআই, সিপিএম, কংগ্রেস, তৃণমূল এবং কোন দল করেন না এরকম দলমত নির্বিশেষে সকল লোকজনকে নিয়েই আন্দোলনের মঞ্চ বা পাবলিক কমিটি গড়ে তোলা হয়েছিল। এই কমিটিই আন্দোলনের ডাক দিয়েছে এবং জনগণ তাতে সাড়া দিয়েছে। নন্দীগ্রামেও এস ইউ সি আই কর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলেছে। এখন রাজ্যের মানুষ জানেন, নন্দীগ্রামের যে অঞ্চলে প্রতিরোধ মাথা তুলেছে, সেখানে সিপিএম-এরই ঘাঁটি ছিল। জনগণ বীরত্বের সাথে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তুলে সিপিএম সরকারকে সাময়িকভাবে হলেও পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে হয়েছে, জমি অধিগ্রহণের নোটিশ জারি করা ভুল হয়েছে। নন্দীগ্রামের দীর্ঘ সংগ্রামী ঐতিহ্য আছে, স্বাধীনতা আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলনের বহু সংগ্রামী ইতিহাস নন্দীগ্রামের রয়েছে। সিঙ্গুরের লড়াই নন্দীগ্রামের জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছে, একথা ঠিক, কিন্তু নন্দীগ্রাম যা পেরেছে সিঙ্গুর তা পারেনি। এটা দুঃখজনক।

নন্দীগ্রামের জনগণের প্রতিরোধ ভাঙবার জন্য সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনী নিয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজছে। এই অবস্থায়, তৃণমূল কংগ্রেস নন্দীগ্রামে নিজস্ব প্রভাব বাড়াতে এবং ভোটের জমি তৈরী করতে যে হটকারী রাস্তা নিচ্ছে তার দ্বারা সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনীকেই আক্রমণ চালাবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে, নন্দীগ্রামের জনগণের রক্তের বিনিময়ে অর্জন করা বিজয়কে বিপন্ন করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এবিষয়ে বারবার সতর্ক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস ওখানে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটিতে থাকলেও, কমিটির সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা করছে না, নিজেদের দলীয় সংকীর্ণ স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। আসলে আন্দোলন মানে শুধু কিছু গরম স্লোগান, আর স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ নয়। একটা গণআন্দোলনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে সঠিক সংগ্রামী রাজনীতি যেমন অবশ্য প্রয়োজন, তার সাথে সঠিক কর্মসূচি ও রণকৌশলও দরকার। এটা ঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হলে, লড়াইয়ে যারা বিরুদ্ধপক্ষ, তার রাজনীতি, কর্মধারা, প্রচার, আক্রমণ, কলাকৌশল সবকিছু বুঝতে হয়। এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও চিন্তাভাবনা নেই, ভোটের রাজনীতিই তাদের একমাত্র চিন্তা।

শুধু ভোটসর্বস্ব রাজনীতিই নয়, সিঙ্গুর আন্দোলনের মূল দাবি থেকেও যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেস সরে এসেছে, সেটা এই দলের শ্রেণীচরিত্রকেও প্রকট করে দিয়েছে। সকলেই জানেন, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামসহ রাজ্যের জনগণের দাবি হচ্ছে, কৃষিজমি ধ্বংস করা চলবে না, আবাসন ও কিছু শিল্প করতে হলে, তা অকৃষি ও বন্ধ কলকারখানার জমিতেই করতে হবে। অথচ, এই মূল দাবি থেকে সরে গিয়ে তৃণমূল সিঙ্গুরে দাবি তুলছে— অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরত দিতে হবে। এইভাবে চাষীদের মধ্য থেকে 'ইচ্ছুক' ও 'অনিচ্ছুক' ভাগাভাগির দ্বারা, আমরা মনে করি, চাষীদের মধ্যে অনৈক্যই সৃষ্টি করা হচ্ছে, যার দ্বারা আন্দোলনেরই ক্ষতি করা হচ্ছে। সিপিএম সিঙ্গুরে এই দাবি না মানলেও অন্যত্র, জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে 'ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক' দাবি অতি দ্রুত মেনে নেবে। কারণ, লোভ ও ভয়ভীতির সাহায্যে 'ইচ্ছুক' চাষীর তালিকা বাড়িয়ে নেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হবে না, একথা সিপিএম জানে। প্রশ্ন হচ্ছে, তৃণমূল কেন মূল দাবি থেকে এভাবে সরে এল? আগেই বলা হয়েছে, পুঁজিপতিদের তুষ্ট রেখেই তৃণমূল আন্দোলন করে। এখানেও পুঁজিপতিদের তারা আশ্বস্ত করে দেখাতে চায় যে, তারা 'দায়িত্বশীল বিরোধী' দল, এমন কিছু তারা করবে না যার দ্বারা একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থে আঘাত লাগে। অথচ, এইভাবে কৃষিজমি ধ্বংস করলে, দেশের মানুষের পক্ষে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হবে। তৃণমূলের নিচুতলার কর্মীরা সাধারণ ঘরেরই মানুষ। সিপিএমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা তৃণমূল করছেন। আমাদের বক্তব্যকে খোলা মনে বিবেচনা করার জন্য আমরা তাদের কাছে আবেদন করছি। কারণ, সিঙ্গুরে জনগণের মধ্যে এখনও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মন আছে, রাস্তা সঠিক হলে আবার প্রতিরোধ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

শুধু তৃণমূল নয়, কংগ্রেস, বিজেপিও ভোটের হিসাব করে আন্দোলনের নকল মহড়া দিচ্ছে। এস ই জেড নিয়ে সিপিএম যে দ্বিচারিতা করছে, অর্থাৎ যে এস ই জেড-এর বিরুদ্ধে অন্য রাজ্যে তারা আন্দোলন করছে, সেই এস ই জেড-কেই এরাজ্যে কার্যকরী করতে

বিরোধী মতকে তারা লাঠি-গুলি চালিয়ে দমন করছে। তেমনই কংগ্রেস, বিজেপিও এ রাজ্যে জমি দখলের বিরুদ্ধে গরম গরম বিবৃতি আর আন্দোলনের মহড়া দিচ্ছে, আবার নিজেরা যেখানে সরকারে আছে সেখানে কৃষকের জমি দখল করছে। এরা কেউই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী নয়। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক জনগণ যেহেতু আজ সিপিএম বিরোধী, তাই এইসব দলগুলো তাকে পুঁজি করে আগামী পঞ্চায়েত-লোকসভা-বিধানসভা ভোটের জমি তৈরি করতে চাইছে। আমরা আগেই বলেছি, এই ভোটসর্বস্ব রাজনীতির চর্চা এস ইউ সি আই করেনা এবং কোনদিন করেনি। আমাদের শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, এস ইউ সি আই গণআন্দোলনের, বিপ্লবী লড়াইয়ের দল। ভোটে একটা আসনও যদি না পাওয়া যায়, একটি ভোটও যদি না জোটে, তাতেও এই দল নীতি-আদর্শকে বিসর্জন দেবে না, গণআন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে শোষিত মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। এই আদর্শ নিয়েই আমরা চলছি। জনগণকে নিয়ে নিরন্তর একটির পর একটি গণআন্দোলন আমরা করে যাচ্ছি, দাবিও কিছু কিছু আদায় করা গেছে। আমাদের শক্তি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, আমাদের শক্তি জনগণ।

কৃষক ও কৃষিজমি রক্ষার বর্তমান আন্দোলন আমরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাব। আন্দোলনকে এই স্তরে উন্নীত করার জন্য সর্বত্র পাড়ায় পাড়ায় গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলার জন্য আমরা জনগণের কাছে আবেদন করছি। কৃষিজমি দখলের প্রশ্ন যেখানে নেই, সেখানেও জনগণের অন্যান্য ন্যায্য দাবিতে অন্দোলনের জন্য গণকমিটি ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা দরকার। এর পাশাপাশি আন্দোলনের কর্মীদের উন্নত রুচি-সংস্কৃতি চরিত্র অর্জনের জন্যও সাধনা করতে হবে, না হলে আন্দোলনের নৈতিক শক্তি গড়ে উঠবে না। ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কেও জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। একটা অঞ্চল ধরে ও পাড়ায় পাড়ায় যে গণকমিটিগুলো গড়ে উঠবে, সেখানে যাঁরাই আন্দোলন চাইবেন তাঁরা যে দলেরই হোন, আসবেন, থাকবেন। কোনও দলকেই অন্ধের মতো অনুসরণ না করার জন্য আমরা বলছি। আমাদের দল এস ইউ সি আই-কেও বিচার করেই জনগণ গ্রহণ করুন, বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করার আগে বিচার করে নিন। গণকমিটিগুলি পরস্পর সংযোগসাধন করে বিভিন্ন দলের বক্তব্য ও কর্মসূচি বিচার করে আন্দোলনের কার্যক্রম ঠিক করবে। একমাত্র এই রাস্তায় আন্দোলন করলেই তা সরকারের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত এবং গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য — দুই টাকা